দারুল উলুম দেওবন্দ-এর মুফতী সাহেবদের সত্যায়িত

সর্বস্তরের উলামা-মাশায়েখ সমর্থিত

দলিল প্রমাণসহ মাসায়েলে শির্ক ও বিদআত সম্পর্কিত

১২০০-এর অধিক মাসলা-মাসায়েল

মুকাম্মাল মুদাল্লাল

মাসায়েলে শির্‌ক ও বিদ্‌আত

মাওলানা রাফ্‌আত কাসেমী

দারুল উলূম দেওবন্দ এর মুফতিয়ানে কেরাম সত্যায়িত
উপমহাদেশের সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম সমর্থিত
মাওলানা রাফআত কাসেমী রচিত

মুকাম্মাল মুদাল্লাল

মাসায়েলে শিরক ও বিদআত

অনুবাদ
মুফতী মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কারীম
ওস্তায, মারকাযুল বুহুস আল ইসলামিয়া ঢাকা

সম্পাদনা
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
শায়খুল হাদীস, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১৬ ৮৫৭৭২৮

পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা
৭১৬৫৪৭৭

প্রকাশক
মুহাম্মদ এন্ড ব্রাদার্স
বাসা : ২১৭, ব্লক : 'ত', রোড : ৪
মিরপুর- ১২, ঢাকা ।

সংশোধিত সংস্করণ
জুমাদিউস সানী ১৪৩৫ হিজরি
এপ্রিল– ২০১৪ ঈসায়ী

কম্পোজ
আল-কাউসার কম্পিউটার্স

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আল-ফয়সাল, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

প্রাপ্তিস্থান
চকবাজার, বাংলাবাজারসহ দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহ

صلى الله عليه وسلم

সংকলকের কথা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والصلوة والسلام على خاتم الانبياء وسيد المرسلين محمد

وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين امابعد

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়ায় মাসআলা চয়ন ও সংকলনের যে কাজের শুভ সূচনা হয়েছিল, সেই ধারাবাহিকতায় নির্বাচিত মাসআলা সংকলনের ১৭তম কিতাব 'মাসায়েলে শিরক ও বিদআত' আজ পাঠক সমীপে উপস্থাপন করা হলো। এই কিতাবটিতে কুফর, শিরক, মান্নত, কুলক্ষণ, তাযিয়াভক্তি, মীলাদ, মৃত্যুপরবর্তী তৃতীয়, দশম ও চল্লিশতম দিনে মৃতব্যক্তির জন্য খানা খাওয়ানোর আয়োজন, ওরস, কবরপূজা, কবরে চুমু খাওয়া, বিভিন্ন কুপ্রথা, ভ্রান্ত আকীদা, জাহিলী যুগের নানা ধরনের কুপ্রথা এবং বিভিন্ন প্রকার বিদআত ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ বহু মাসআলার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে।

উল্লেখ্য বিদআত ও কুপ্রথার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সার্বজনীনতা ও ব্যাপ্তী লাভ করেনা। কুরআন হাদীসে এর কোনো ভিত্তি নেই বিধায় বিশ্বব্যাপী তা প্রসার লাভ করে না। তাই প্রত্যেক এলাকার লোকজন তাদের নিজস্ব স্বভাব ও চাহিদা মত বিদআত ও কুসংস্কার আবিস্কার করে। অন্য এলাকায় এর কোন সংবাদই পৌছেনা, বরং তারা তাদের স্বভাবগত চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন কোন কুপ্রথার আবিস্কার করে বসে। তাইতো এলাকা ভেদে বিদআতের ধরণ ও প্রকারের মধ্যেও ভিন্নতা দেখা যায়। সর্বোপরি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ এবং দারুল উলূম দেওবন্দ এর মুফতিয়ানে কেরামের নেক নযরের ফল।

হে আল্লাহ! এসব বিজ্ঞ আকাবেরকে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার সাথে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন এবং তাঁদের ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন। আর পূব প্রকাশিত কিতাবগুলোর ন্যায় এ কিতাবটিকেও কবুল করে আখিরাতের জন্য পাথেয় বানিয়ে দিন। ভবিষ্যতেও এ জাতীয় দ্বীনী খিদমত বেশি বেশি করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

১০/ মুহাররম ১৪২৪ হিজরী

মুহাম্মদ রাফআত কাসেমী
ওস্তায, দারুল উলূম দেওবন্দ

দারুল উলূম দেওবন্দ এর শায়খুল হাদীস

হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা.

এর অভিমত

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد

দারুল উলূম দেওবন্দ এর ওস্তায মাওলানা মুহাম্মদ রাফআত কাসেমী সাহেব আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে তওফীক প্রাপ্ত লেখক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা ব্যাপক কাজ নিচ্ছেন। তাঁর বহু গুরুত্বপূর্ণ সংকলন ইতিপূর্বে সগৌরবে পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়ে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। মুহতারাম লেখক এ পর্যায়ে 'মাসায়েলে শিরক ও বিদআত' নামে একটি নতুন কিতাব সংকলন করেছেন। এটি তাঁর সতেরতম কিতাব। শিরক মানব জাতির মধ্যে বিস্তার করা সেই ধ্বংসাত্মক অপরাধ যা ক্ষমা অযোগ্য। হাদীস শরীফে এটাকে সর্বনিকৃষ্ট ও সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শিরক এর বহু প্রকার রয়েছে। 'শিরক ফিয্যাত' (আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে অংশীদার স্থাপন করা) শিরক ফিস্‌সিফাত (আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির মধ্যে অংশীদার স্থাপন করা) ইত্যাদি। এমনকি লৌকিকতা এবং সুখ্যাতি অর্জন প্রবণতাও এর অন্ত র্ভুক্ত। এজন্যই শিরক থেকে বাঁচার জন্য একজন মু'মিনকে শিরক এর বিস্তারিত পরিচিতি ও বিধি-বিধান অবশ্যই জেনে নিতে হবে।

একইভাবে বিদআত ও অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। হাদীস শরীফে এ থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা এবং দ্বীন হিসেবে তার অনুপ্রবেশ ঘটানোর ওপর শক্ত ভাষায় নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে। কারণ এর দ্বারা দ্বীনের মূলরূপই বিকৃত হয়ে যায়। কেননা বিদআতযুক্ত দ্বীন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আণীত দ্বীন এক নয়, কখনোই এক হতে পারে না বরং তা মুর্খদের আবিস্কৃত কুপ্রবৃত্তি প্রসূত বিভিন্ন কুপ্রথা। এগুলোর ওপর আমল করে না কেউ দ্বীনদার হতে পারে, না পারে মুক্তিপেতে । তাই বিদআত মুক্ত পবিত্র জীবন যাপনের জন্য বিদআত সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করাও একান্ত জরুরী।

মাওলানা রাফআত কাসেমী সাহেবের এই কিতাব দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ বিশেষ মনোযোগের সাথে কিতাবটি অধ্যয়ন করার মাধ্যমে বহু ইলম অর্জন করতে পারবেন। আমার বিশেষ দু'আ! লেখকের সংকলিত অন্যান্য কিতাবের ন্যায় এই কিতাবটিও যেন আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন এবং উম্মতের আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের মাধ্যম বানিয়ে দেন, আর সম্মানিত লেখকের জন্য আখেরাতে নাজাতের ওসীলা হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

(মুফতী) সাঈদ আহমদ পালনপুরী

০৫ জুমাদালউলা ১৪২৪ ওস্তায, দারুল উলূম দেওবন্দ

দারুল উলূম দেওবন্দ এর স্বনামধন্য মুফতী

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যফীরুদ্দীন সাহেব দা. বা.

এর সত্যায়ন

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

আল্লাহ তা'আলার লাখো শোকর। দ্বীনি জীবনযাত্রার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ ও ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীনের বিধি-বিধান ও মাসআলা মাসায়েলের সাথে তারা গভীর আন্তরিকতা প্রদর্শন করে। তদ্রূপ তাদের আমলী জযবাও সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর তুলনায় মুসলমানদের জীবন যাত্রা অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। মসজিদগুলো আবাদ দেখা যাচ্ছে সকল প্রান্তে। জায়েয নাজায়েযের ব্যাপারে তাদের পূর্ণ সতর্কতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ওলামায়ে কেরামের মাঝেও দীনী ইলমের চর্চা ও গবেষণা উন্নত হচ্ছে। মাসআলা অনুসন্ধানে জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিধি-বিধান এবং মাসআলা মাসায়েলকে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে কিতাবের আকৃতিতে সংকলিত রূপ দেয়া হচ্ছে।

এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি বিদ্যাপীঠ এমনকি সারা পৃথিবীতে নিজ বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা। রাত দিন এতে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তা'লিম হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের সকল ওস্তাযই পাঠদানের পাশাপাশি সংকলনের প্রতিও আগ্রহ ও উৎসাহ রাখেন এবং জাতি ও রাষ্ট্রের সকল বিভাগে দিক নির্দেশনা ও পথ প্রদর্শনের সুমহান দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকেন।মাওলানা মুহাম্মদ রাফআত কাসেমী সাহেবের বহু কিতাব ইতিপূর্বে প্রকাশ পেয়ে পাঠকদের নিকট ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। পাঠকবৃন্দ তাঁর কিতাব থেকে উপকৃত হয়ে আসছেন বিশেষভাবে। বিভিন্ন ভাষায় তার কিতাবগুলো অনূদিতও হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর খেদমতকে কবুল করুন।

'মাসায়েলে শিরক ও বিদআত' নামক বক্ষমান কিতাবটি অধমের সামনেই আছে। অতি আগ্রহের সাথে আমি কিতাবটি অধ্যয়ন করেছি। এর বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব দেখে হৃদয়টা আনন্দে ভরে গেছে। কারণ সম্মানিত লেখক ফিকহ ও ফাতওয়ার কিতাব থেকে চয়ন করে শিরক-বিদআত এবং ভ্রান্ত প্রথা সংক্রান্ত মাসআলাগুলো একত্রিত করেছেন এবং প্রত্যেকটি মাসআলার হাওয়ালাও দিয়েছেন বরাবরের মত। আল্লাহপাক তার নেক হায়াত বৃদ্ধি করেন এবং তাকে ইলমী ও আমলী মেহনত এর তাওফীক দান করেন। এ জাতীয় দ্বীনী ইলমী কাজ সর্বদা চালিয়ে যেতে পারেন সে তাওফীক দান করেন। আমীন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

দু'আ প্রার্থী

১১ রবিউস সানী ১৪২৪ হিজরী

মুহাম্মাদ যফীরুদ্দীন

(মুফতী) দারুল উলূম-দেওবন্দ

দারুল উলূম দেওবন্দ এর মুফতী

হযরত মাওলানা মুফতী কাফীলুর রহমান নিশাত উসমানী সাহেব এর

অভিমত ও দু'আ

ইলম এবং কিতাবের অঙ্গনে দারুল উলূম দেওবন্দ এর ওস্তায মাওলানা রাফআত কাসেমী সাহেব যে একজন মকবূল ব্যক্তিত্ব এ বিষয়টির পরিচয় দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। ইতিপূর্বে সম্মানিত লেখকের ১৬টি কিতাব প্রকাশ লাভ করে পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে।

মুহতারাম লেখকের কিতাবসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাসআলা বর্ণনার সাথে সাথে তিনি নির্ভরযোগ্য হাওয়ালা তথা তথ্যসূত্র উল্লেখের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ফলে কিতাবের নির্ভরযোগ্যতা ও এর প্রতি আস্থা বৃদ্ধির কারণে অধিক উপকারীও হয়ে থাকে। সাধারণ লোকজন ছাড়াও ওলামায়ে কেরামগণের জন্যও তা বিশেষ উপকারী। কারণ খুব সহজেই তাঁরা মূল সূত্রগ্রন্থগুলো থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারেন।

'মাসায়েলে শিরক ও বিদআত' কিতাবটি নিজ বিষয়বস্তুতে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। শিরক ও বিদআত, প্রচলিত ঈসালে সওয়াবের পদ্ধতি, প্রচলিত মীলাদ প্রথা, তীজা, চল্লিশা, নযর ও মান্নত, তাযিয়া পূজা, কবর পূজা ইত্যাদি শিরক ও বিদআতের সকল অঙ্গন সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল এ কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাঁর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের হাওয়ালার মাধ্যমে এর সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছে বহুগুণ।

সম্মানিত লেখক এভাবে সমুদ্রকে একটি লোটার মধ্যে একত্রিত করে দিয়েছেন এবং শিরক বিদআত সংক্রান্ত বহু মৌলিক বিধিবিধান একত্রিত করার জন্য কঠোর সাধনা ও শ্রম ব্যয় করেছেন।

আশা রাখি, লেখকের অন্যান্য কিতাবের ন্যায় এ কিতাবটিও সর্বসাধারণ্যে ব্যাপক সমাদৃত হবে। আল্লাহপাক লেখককে এ জাতীয় উপকারী রচনাবলী উপহার দেয়ার জন্য আরো বেশি বেশি তাওফীক দান করুন এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

কাফীলুর রহমান নিশাত

১৩ রবিউসসানী-১৪২৪ হিজরী

সূচীপত্র

সমাপ্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহা পাপ করল। —সূরা নিসা ৪ : ৪৮

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েও ক্ষমা করবেন না, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক তথা অংশীদার স্থাপন করে; বরং সর্বদা শাস্তির মধ্যে গ্রেফতার করে রাখবেন। এ (শিরক) ছাড়া অন্যান্য সব গুনাহ থেকে যাকে খুশি ক্ষমা করে দিবেন, চাই তা সগীরা গুনাহ হোক বা কবিরা। অবশ্য কোনো মুশরিক যদি মুসলিম হয়ে যায় তাহলে যেহেতু সে মুশরিকই রয়নি; তাই তার শাস্তিও মওকুফ হয়ে যাবে। আর শিরক এর গুনাহ ক্ষমা না করার কারণ হচ্ছে— আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী মারাত্মক পাপ সংঘটিত করেছে যা তার জঘন্যতার কারণে ক্ষমার অযোগ্য।

ব্যাখ্যা ও মাসায়েল

শিরক এর সংজ্ঞা এবং কিছু ধরণ

আল্লাহ তা'আলার বাণী إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং গুণাবলীর ব্যাপারে যে আকীদা ও বিশ্বাস রয়েছে; মাখলূকের মধ্য হতে কারো ব্যাপারে ওই বিশ্বাস রাখাই শিরক।[১]

এর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ :

ইলম এর মধ্যে অংশীদার সাব্যস্ত করা : কোনো বুযুর্গ বা পীর সাহেবের ব্যাপারে এ বিশ্বাস রাখা যে, আমাদের সার্বিক অবস্থা সর্বাবস্থায়

১. আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত (উপাসনা) করা কিংবা যেসব বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা'আর নিকট প্রার্থনা করতে হয়, সেগুলো গাইরুল্লাহ এর নিকট প্রার্থনা করাকেই শিরক বলে। যেমন : গাইরুল্লাহ এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, সন্তান চাওয়া ইত্যাদি। তাফসীরে মাযহারী ২/৪৫৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম করাচী ১/৮৫

উনি অবগত থাকেন। তদ্রূপ কোনো গণক, জ্যোতিষী, কিংবা সাধকের নিকট অদৃশ্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করা। বুযূর্গ ব্যক্তির কথা থেকে ফাল (পূর্বলক্ষণ) দেখে এটাকেই নিশ্চিত জ্ঞান করা, দূর থেকে কাউকে এ বিশ্বাসে ডাকা যে, এ ডাক সে শুনতে পাবে, অথবা কারো নামে রোযা রাখা ইত্যাদি।

ক্ষমতার মধ্যে অংশীদার স্থাপন করা : কাউকে উপকার ও ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন মনে করা, কারো কাছে কাঙ্খিত বস্তু কামনা করা, জীবিকা এবং সন্তান সন্তুতি প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

ইবাদতের মধ্যে অংশীদার সাব্যস্ত করা : কাউকে সিজদা করা, কারো নামে প্রাণী উৎসর্গ করা, কারো নামে মান্নত করা, কারো কবর কিংবা বাড়ী তাওয়াফ করা, আল্লাহ তা'আলার বিধানের মোকাবিলায় অন্য কারো কথা বা নিয়মকে প্রধান্য দেয়া, কারো সামনে রুকুর ন্যায় ঝুঁকে পড়া, কারো নামে প্রাণী যবাই করা, দুনিয়ার কার্যাবলী তারকারাজির প্রভাবে হয় বলে বিশ্বাস করা এবং কোনো মাসকে কুলক্ষণে মনে করা। বেদীমূলে পাঠা উৎসর্গ করা, কারো দোহাই দেয়া কাবা ঘরের ন্যায় কোনো জায়গার আদব-সম্মান করা। উপরোক্ত বিষয়গুলো ইবাদত সংক্রান্ত শিরকের অন্তর্ভূক্ত। ইত্যাদি।

তাওহীদের সংজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর স্বত্তা এবং গুণাবলীতে **এক ও অদ্বিতীয় এবং তুলনাবিহীন মনে করা**। ইসলামী শরীয়তে তাওহীদ বলতে গণিত শাস্ত্রবিদদের প্রচলিত নিছক ১ (এক) সংখ্যাটি উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা পারিভাষিক একক উদ্দেশ্য। আর পরিভাষায় একাত্মবাদ বলতে কোনো সত্তা ও গুণাবলী নিরঙ্কুশভাবে একক, অদ্বিতীয় এবং তুলনাবিহীন হওয়াকে বোঝায়। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন শরীফকে কালামে ইলাহী হিসেবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে না মানে, (আল্লাহ না করুন) সে আল্লাহ তা'আলাকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে।

কেননা কুরআন শরীফকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কালাম হিসেবে, আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য নবীগণকে তাঁর নবী ও রসূল বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং এ বিষয়কে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, সে আল্লাহ

তা'আলাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করার পাশাপাশি তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে কশ্মিনকালেও সে একাত্মবাদী হতে পারে না। অর্থাৎ সে কাফের।

–ইমদাদুল আহকাম ১/১৩৫

কুফরের পরিচয়

মাসআলা : যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা জরুরি, ওই বিষয়গুলো হতে কোনো একটা বিষয় না মানার নামই 'কুফর'। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ তা'আলার সত্তা কিংবা তাঁর গুণাবলীকে অস্বীকার করে, একাধিক খোদায় বিশ্বাস করে, কিংবা ফেরেশতাদেরকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিতাবসমূহ হতে কোনো একটা কিতাব অস্বীকার করে, কিংবা কোনো নবীকে অবিশ্বাস করে বা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে অথবা আল্লাহ তা'আলার অলঙ্ঘনীয় বিধানগুলো থেকে কোনো একটা বিধান অস্বীকার করে কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ভাণ্ডারের কোনো একটি হাদীসকে মিথ্যা বলে মনে করে তবে এসব অবস্থায় ঐ ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

শিরক এর পরিচয়

মাসআলা : শিরক হলো আল্লাহ তা'আলার স্বত্ত্বা এবং গুণাবলীর মধ্যে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। সত্তার মধ্যে অংশীদার সাব্যস্ত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে একাধিক স্রষ্টা/খোদা মেনে নেয়া। খ্রিস্টানরা তিন খোদায় বিশ্বাস স্থাপনের কারণে মুশরিক সাব্যস্ত হয়েছে। দুই খোদায় বিশ্বাসী হওয়ায় অগ্নি পূজারীরা মুশরিক হয়েছে। একইভাবে বহু খোদায় বিশ্বাস করায় মূর্তি পূজারীরা মুশরিক।

মাসআলা : আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে কাউকে শরীক করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ন্যায় গুণাবলী অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা, এটা শিরক। কেননা কোনো ফেরেস্তা, নবী, ওলী, শহীদ, পীর কিংবা ইমাম সর্বোপরি কোন মাখলূকের মাঝে আল্লাহপাকের গুণাবলীর ন্যায় গুণাবলী হতে পারে না।

মাসআলা : শিরকের অনেক প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রকার নিম্নরূপ :

১। **ক্ষমতার মধ্যে অংশীদার সাব্যস্ত করা**। অর্থাৎ আল্লাহর ন্যায় কুদরত বা ক্ষমতা অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন : এ বিশ্বাস রাখা যে, অমুক পয়গম্বর, ওলী, শহীদ বা অন্য কেউ বৃষ্টি নামাতে পারে, ছেলে-মেয়ে দিতে পারে, অন্তরের চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে। কিংবা এ বিশ্বাস রাখা যে, জীবন-মৃত্যু তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে অথবা উপকার ও ক্ষতি পৌঁছানোর ব্যাপারে কাউকে ক্ষমতাবান মনে করা, এ সবগুলোই শিরক।

২। **ইলম গুণে অংশীদার সাব্যস্ত করা** : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী এরূপ বিশ্বাস করা। যেমন : এরূপ ধারণা করা যে, আল্লাহ তা'আলার ন্যায় অমুক নবী কিংবা ওলী অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। অথবা এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলার ন্যায় তারাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে অবগত। তারা আমাদের কাছের ও দূরের সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত-এজাতীয় বিশ্বাস রাখাই ইলম গুণে অংশীদার স্থির করা।

৩। **শ্রবণ এবং দর্শনগুণে অংশীদার স্থির করা** : আল্লাহ তা'আলার শ্রবণ এবং দর্শন গুণে কাউকে অংশীদার স্থির করা। যেমন– এ বিশ্বাস রাখা যে, অমুক পয়গম্বর কিংবা ওলী যেখানেই থাকেন না কেন আমাদের কাছের এবং দূরের যাবতীয় কথাবার্তা শুনতে পান এবং আমাদের যাবতীয় কাজ দেখতে পান, এসবই শিরক।

৪। **বিধানদাতা গুণে অংশীদার সাব্যস্ত করা** : আল্লাহ তা'আলার ন্যায় অন্য কাউকে বিধানদাতা মেনে নেয়া এবং আল্লাহর বিধানের ন্যায় তার বিধানও পালন করা। যেমন : কোনো পীর সাহেব আদেশ করলেন যে, অমুক অযীফা আসরের নামাযের পূর্বে আদায় করতে হবে। তাঁর আদেশ পালনকে এতই জরুরী মনে করা যে, ওই অযীফা পূরা করতে গিয়ে আসর নামায মাকরূহ সময়ে নিয়ে যায় অথবা নামায কাযা করতেও পরওয়া করে না, এটাও শিরক।

৫। **ইবাদতে শিরক করা** : আল্লাহ তা'আলার ন্যায় কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। উদাহরণ স্বরূপ : কবর বা পীরকে সিজদা করা, কারো জন্য রুকু করা, কিংবা কোনো পীর, পয়গম্বর, ওলী এবং ইমামের নামে রোযা রাখা, কারো নামে মান্নত করা অথবা কোন কবর কিংবা পীরের ঘর কাবা শরীফের ন্যায় প্রদক্ষীণ করা, এসবগুলোই ইবাদতে শিরক এর অন্তর্ভুক্ত। –তা'লীমুল ইসলাম : ৪ ও ২, আপকে মাসায়েল : ১/ ৪১

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আল কুরআনুল করীম-সূরা নিসা, বুখারী শরীফ : ২/৩৩৬, (কিতাবুর রিকাক) মিশকাত শরীফ : ২/৮২৭, মুসলিম শরীফ ১/১৬ (কিতাবুল ঈমান) তিরমিযী শরীফ ২/১০৩, মাযাহেরে হক ৪/৩৩৪ ।

মাসআলা : শিরক এর শব্দগুলো উচ্চারণ করাতো দূরে থাকুক, এগুলোর কাছেও যাওয়া যাবে না। অতএব সন্তান সন্ততি লাভের জন্য কিংবা সন্তানদের দীর্ঘ জীবনের জন্য যাদু মন্ত্র বা টোনা ইত্যাদি করা যাবে না। 'ফাল' বা শুভ লক্ষণ ইত্যাদি তুলবে না, ওলীদের উদ্দেশ্যে মান্নত ইত্যাদি করবে না, বুযুর্গদের জন্য মান্নত করবে না, শবে বরাত, মুহররম এবং আরাফা দিবসে 'তবারক' এর রুটি, হালুয়া ইত্যাদি বানাবে না। এমনিভাবে যে সব স্থানে এ জাতীয় কুপ্রথা ও অপসংস্কৃতির চর্চা হয় সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকা চাই। —বেহেস্তি যিওয়ার : ৭/৬২

প্রশ্ন : যে শিরক এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ বলেছেন সে শিরক এর হাকীকত কী? এই শিরক এর এমন কোনো স্তর আছে যে কোন কোন গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করলে মুক্তি পাওয়া যাবে আবার কোন কোন গায়রুল্লাহকে শরীক করলে মুক্তি পাওয়া যাবে না। যেমন : একতো হচ্ছে বুযুর্গদের কবর কিংবা তা'জিয়াকে বিশেষ নিয়তে ও বিশ্বাসের সাথে সিজদা করা, উদ্দেশ্যাবলী প্রার্থনা করা কিংবা তাদের উদ্দেশ্যে হালুয়া-রুটি, শিরনী ইত্যাদির মান্নত পেশ করা। দ্বিতীয়ত ঃ মূর্তি কিংবা বৃক্ষ ইত্যাদিকে একই উদ্দেশ্যে এবং আকিদা বিশ্বাস নিয়ে সিজদা করা, এগুলোর কাছে কাঙ্খিত বিষয়াবলী প্রার্থনা করা, হালুয়া-রুটি ইত্যাদি হাদিয়া দেয়া।

এ ক্ষেত্রে এসব বুযুর্গ আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে তাদেরকে সিজদা ইত্যাদি করার কারণে ক্ষমাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। আর মূর্তি, বৃক্ষ ইত্যাদির সাথে একই আচরণ করা হলে নাজাত পাওয়া যাবে না?

যদি এমনটি না হয়, বরং শিরক এর সকল স্তরই ক্ষমার অযোগ্য হয়, তাহলে বুযুর্গদের কবর ও তাযিয়াকে সিজদা করা, তাদের নিকট উদ্দেশ্যাবলী প্রার্থনা করা, হালুয়া-রুটি ইত্যাদির মান্নত মানাকে ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ বলা হয় না কেন? পক্ষান্তরে পীল বৃক্ষ এবং মূর্তির সাথে

একই আকিদা ও বিশ্বাস এবং একই আচরণ করাকে ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ বলা হয়। অথচ আরবের মুশরিকরা মূর্তিসমূহকে আল্লাহর অধিনস্ত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে মনে করত। তারা বলত–

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

আমরাতো আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই এসব মূর্তির উপাসনা করে থাকি।

যেমনিভাবে কারবালার শহীদগণের রাযি. দিকে তাযিয়ার সম্পর্ক করা হয়, তদ্রূপ আম্বিয়ায়ে কেরামগণের দিকেও মূর্তিগুলোকে সম্পৃক্ত করা হতো। কোনো কোনো মূর্তি হযরত ইবরাহীম আ.-এর নামের সাথে, কোনটি হযরত ইদরীস আ.-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। অতএব শিরকের হাকীকত কী? জানতে চাই।

উত্তর : যে শিরক এর গুনাহ হতে মুক্তি পাওয়া যায়না এবং জাহান্নামের যোগ্য হতে হয় হাশিয়ায়ে খেয়ালী– শরহুল মাকাসেদ থেকে তার সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো–

إن الكافر إن أظهر الإيمان فهو المنافق. وإن أظهر كفره بعد الإيمان فهو المرتد.

وإن قال بالشريك في الألوهية فهو المشرك.

অর্থ : কাফির যদি ঈমান প্রকাশ করে তবে সে মুনাফিক, যদি ঈমানের পর কুফরি প্রকাশ করে তাহলে সে মুরতাদ, আর আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করলে সে মুশরিক।

সুতরাং মূর্তিপূজারী আরবের মুশরিক এবং কবর ও তাজিয়া পূজারী মুসলমানদের মাঝে পার্থক্য আছে। আরবের মুশরিকরা ঐ সব মূর্তিকে আল্লাহর ইবাদতে শরীক করত এবং মৌখিকভাবেও আল্লাহর অংশীদার বলত। আল্লাহ তা'আলার এই বাণী তাদের ঐ কাজের প্রমাণ বহন করে।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا

هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا

অর্থ : আল্লাহ যে শস্য ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্য হতে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে এটা আল্লাহর জন্য এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্য।

–সূরা আল আনআম : ৬-১৩৬

আল্লাহ তা'আলার বাণী – وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ

আর তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে জীন এবং মানুষদের মধ্য থেকে অনেককে অংশীদার স্থির করে। —সূরা আল আনআম- ৬ : ১০০

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

তারা আল্লাহর সাথে অনেককে শরীক করে।—সূরা ইবরাহীম : ১৪ : ৩০

যদিও তারা এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করত, তথাপি কালিমায়ে তাওহীদ এর ব্যাপারে তারা متوحش ঘৃণা করত। তারা তালবিয়া পাঠের সময় বলত—

لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وماملك

'আমি উপস্থিত হয়েছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, তবে একজন অংশীদার রয়েছে তার এবং তার মালিকানাধীন সব কিছুর মালিকও আপনি।'

পক্ষান্তরে কবর এবং তাজিয়া পূজারীরা এরকম নয়। তারা কালিমায়ে তাওহীদকে অস্বীকার করে না, অথবা ঘৃণাও করে না। বরং নিঃসংকোচে আল্লাহকে এক মাবুদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে।

আরবের মুশরিকদের ন্যায় হিন্দুরা তাদের প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করে এবং কালিমায়ে তাওহীদকে অস্বীকার করে।

সুতরাং উভয় গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে— কবর এবং তাজিয়া পূজারীরা আমলী (কার্যত) শিরক করলেও নিজেদেরকে মুসলিম এবং একাত্মবাদী বলে দাবী করে। পক্ষান্তরে হিন্দুদের শিরক হচ্ছে ই'তিকাদী (তথা বিশ্বাসগত) এবং আমলী উভয়টার সম্মিলিতরূপ। এ বিষয়টিও জেনে রাখা চাই যে, সাধারণভাবে গায়রুল্লাহকে সিজদা করা সকল ক্ষেত্রে শিরক হয় না; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শিরক এর আলামত হয়। প্রকৃত শিরক তো সেটাই যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

القول بالشريك فى الألوهية قلبا ولسانا

অর্থাৎ-আল্লাহপাকের ইবাদতে কাউকে আত্মিক বা মৌখিক অংশীদার সাব্যস্ত করাকেই শিরক বলা হয়।

قال فى شرح العقائد :ولا نزع فى ان من المعاصى ما جعله الشارع امارة للتكذيب وعلم كونه كذلك بالأدلة الشركية كسجود الصنم والقاء المصحف فى القاذورات , والتلفظ بالفاظ الكفر.

শরহুল আকাইদ গ্রন্থকার বলেন, দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এমন আলামত ও লক্ষণ যেগুলো শিরকী লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যেগুলো গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই যেমন : মূর্তি পূজা করা, কুরআন শরীফ ময়লা আবর্জনাতে নিক্ষেপ করা এবং কুফরী কোনো শব্দ উচ্চারণ করা।

–শরহুল আকাইদ : পৃ. ১৪৮

কবর এবং তাজিয়ার সিজদা করা দ্বীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার লক্ষণ নয়। কারণ কাফেরদের নিকট এগুলোর ইবাদত প্রচলিত নয়। হ্যাঁ- কাফেরদের ধর্মে যেগুলোর পূর্জা অর্চনার প্রচলন রয়েছে, সেগুলো থেকে কোন একটিকে সিজদা করার দ্বারা বিচারিক ভাবে কুফর সাব্যস্ত হয়ে যাবে। –হাশিয়া, শরহুল আকাইদ : ১৪৮

আর দিয়ানত এর দিক থেকে বিধান হবে, যদি অন্তরের বিশ্বাস ও ঈমানের মধ্যে ত্রুটি না আসে তাহলে আল্লাহর নিকট সে মু'মিন হিসেবে ধর্তব্য হবে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. 'সিরাতে মুসতাকীম' (পৃষ্ঠা- ১৫০-১৬৫) দ্রষ্টব্য। এই অধ্যায়ে তিনি কবর এর শ্রদ্ধা এবং এর সিজদা করাকে কঠিন ধমকীর স্বরে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ কাজে জড়িতদেরকে কাফের বা মুশরিক বলেন নি। তবে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ কাজ বলেছেন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। হাদীস শরীফে এসেছে-

لعن الله أقواما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

"আল্লাহ তা'আলা এসব সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করুন, যারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদার স্থান বানায়।"–আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শাইবা, হাদীস– ১১৯৪২।

اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد

হে আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে পূজার স্থান বানিয়েন না।

– আল মুআত্তা, ইমাম মালেক, হাদীস– ৪১৪

এই হাদীস থেকে ফুকাহায়ে কেরাম কবরে সিজদা শুধুমাত্র হারাম হওয়ার মাসআলা উৎসারণ করেছেন। কিন্তু কবরে সিজদা করার কারণে কাউকে কাফের বলেন নি।

তবে যদি ইবাদতের নিয়তে কবরে সিজদা করে এবং কবরওয়ালাকে মা'বুদ মনে করে অর্থাৎ স্রষ্টার সাথে অংশীদার মনে করে তাহলে তা শিরক এর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

এ সকল ইবারাত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, কবর এবং তাজিয়া পূজারীদের মধ্যে যারা কবর বা তাজিয়া ওয়ালাকে অদৃশ্য ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তারা মুশরিক। আর যারা বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শণের লক্ষে সিজদা ইত্যাদি করে, কিন্তু এগুলোর নিজস্ব কোন ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস না করে, তারা শিরকে আমলীর কারণে ফাসেক হলেও কাফের হবে না।

আর হযরত শায়খ রহ. অদৃশ্য ক্ষমতার অধিকারী হওয়া না হওয়ার বিশ্বাস এর মানদন্ড বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, কারো কারো এ বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকবর্তী বিশেষ কোন বান্দাহকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন, যার দ্বারা ঐ ব্যক্তি তার পক্ষ বা বিপক্ষ কাউকে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই উপকার বা ক্ষতি পৌঁছাতে সক্ষম। তবে এই ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার কুদরতী কব্জায় নিয়ন্ত্রীত; যে কোনো মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নিতে তিনি পূর্ণ সক্ষম। যেভাবে বাদশাহগণ তাদের অধিনস্ত প্রতিনিধিদের হাতে বিশেষ কিছু ক্ষমতা এমনভাবে দিয়ে দেয় যেগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বাদশাহ এর অনুমোদন এর প্রয়োজন পড়ে না। যদিও সে ক্ষমতা প্রত্যাহারের বিশেষ পাওয়ার বাদশাহের থাকে। এটাই হলো গাইরুলাহ এর ক্ষমতার বিশ্বাস। (আরবের মুশরিকরা তাদের ভ্রান্ত ও বাতিল মূর্তিগুলোর ব্যাপারে এ আকিদা পোষণ করত)

আবার কেউ কেউ এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, কোন গাইরুল্লাহ এর মধ্যে এরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতা নেই। তবে কোন কোন বান্দাহ আল্লাহ তা'আলার এত বেশি নৈকট্য অর্জন করে যে, তার ওসীলা নিয়ে দুআ করলে দু'আকারীদের জন্য ঐ বান্দাহ সুপারিশ করে। এই সুপারিশের পরও কারো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তাকে দেয়া হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলাই উপকার, ক্ষতি ইত্যাদি পৌঁছিয়ে থাকেন। তবে ঐ বান্দার সুপারিশ কখনোই অগ্রাহ্য করা হয় না। ফলে এই সুপারিশ লাভের জন্য ঐ বান্দার সাথে সরাসরিভাবে বা পরোক্ষভাবে ইবাদতের ন্যায় মু'আমালা করে থাকে।

এ জাতীয় বিশ্বাস গায়রুল্লাহর মধ্যে বিশেষ ক্ষমতার বিশ্বাস না হলেও কোনধরনের দলীল প্রমাণ ব্যতীত এবং শরীয়তের দলীলের সাথে

সাংঘর্ষিক। তাই এ জাতীয় আকিদা পোষণ করা বিশ্বাসগত গুনাহ, আর ইবাদত সুলভ আচরণ করা আমলী গুনাহ বলে বিবেচিত হবে। শিরক এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এ জাতীয় সবব বা কারণকে শরঈ সাধারণ পরিভাষায় 'মুশরিক' বলা হয়ে থাকে।

قال الشيخ اشرف على رح هذا ما سنح لى والله اعلم ......وقالوا اجعل الالهة الها واحدا ,والله اعلم.

হযরত শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, এ কারণে আমাদের মাশায়েখ ও আকাবিরগণ কবর পূজারী ও কবরে সিজদা কারীদেরকে কাফের বলেন না, তাঁরা এদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন, প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন না। এর প্রমাণ হলো কবর পূজারী শ্রেণী ইসলাম এবং একত্তবাদের দাবী করার পাশাপাশি তারা শিরক থেকে পবিত্র বলে দাবি করে। কিন্তু আরবের এবং হিন্দুস্তানের মুশরিকরা এদের থেকে ভিন্ন। কারণ তারা একত্ববাদকে অস্বীকার করে এবং তাদের দেবতাদেরকেও যৌথ ক্ষমতাধর মনে করে। আর তারা বলে اجعل الالهة الها واحدا

–ইমদাদুল আহকাম : ১/১১৮, ১২

অস্বাভাবিক বিষয়াবলি এবং শিরক

প্রশ্ন : আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কোনো ক্ষমতা প্রদান করেছেন কি না? যেমন– কোনো কোনো নবী মৃতদের জীবন দান করেছেন, কিছু ফেরেশতা বাতাস নিয়ন্ত্রণ করেন, কোনো কোনো ফেরেশতা বৃষ্টি প্রবাহিত করেন। কিন্তু তাওহীদ সংক্রান্ত কিতাবসমূহে রয়েছে যে, কারো উপকার কিংবা ক্ষতি করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো বিন্দু পরিমাণ ক্ষমতাও নেই। চাই নবী হোক কিংবা ওলী। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে উপকার কিংবা ক্ষতিতে ক্ষমতাবান মনে করা শিরক কি না?

উত্তর : যেসব বিষয় স্বাভাবিক উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্টতা রাখে, যেমন কোনো ক্ষুধার্থ ব্যক্তি কারো কাছে রুটি চাওয়া, এটা শিরক নয়। আর আম্বিয়া এবং আওলিয়ায়ে কেরামগণ থেকে যেসব অস্বাভাবিক বিষয়াবলি প্রকাশ পেয়ে থাকে সেগুলোকে মু'জিযা এবং কারামাত বলা

হয়। এগুলো আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতাবলেই হয়ে থাকে। যেমন : হযরত ঈসা আ. কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, এটা তাঁর ক্ষমতাবলে হয় নি; বরং আল্লাহ তা'আলার কুদরতেই হয়েছে; এটাও শিরক নয়। একই অবস্থা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে অস্বাভাবিক বিষয়াবলিতে কোনো নবী বা ওলীকে ক্ষমতাবান মনে করা 'শিরক'। —আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল : ২/৪৩

কাফির এবং মুশরিক এর মাঝে পার্থক্য

মাসআলা : হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত দ্বীনের কোনো বিষয়ের অস্বীকারকারীকে কফের বলা হয়, আর আল্লাহ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী অথবা তাঁর কার্যাবলীর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপনকারীকে মুশরিক বলা হয়।

মাসআলা : কাফির এবং মুশরিকদের নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ এটাতো কুরআনী ফয়সালা। আল্লাহ তা'আলার বাণী—

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (اَلتَّوْبَ : ٩—٢٨)

তবে তাদের নাপাকী বাহ্যিক নয়, আত্মিক। অতএব কাফের মুশরিকদের হাত মুখ পাক থাকলে তাদের সাথে খানা খাওয়া জায়েয হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তরখানে কাফেররাও খানা খেয়েছে।

উল্লেখ্য যে সকল কাফের মুশরিক নয়। যে ব্যক্তি জরুরিয়্যাতে দ্বীন এবং অকাট্য বিষয়সমূহ অস্বীকার করে সে কাফের হলেও তাকে মুশরিক বলা হয় না। মুশরিক তাকেই বলা হয়, যে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে। চাই তা আল্লাহর সত্তার সাথে হোক কিংবা তাঁর গুণাবলী, কাজকর্ম বা অন্য কোনো বিষয়ে হোক। উভয় শ্রেণীর অপরাধীদের ক্ষমা না করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন।

—ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/১১৭

কাউকে কাফের বলা

মাসআলা : হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি কাউকে কাফের বলবে তাদের মাঝে একজন কাফের হবে। যাকে কাফের বলা হয়েছে, বাস্তবেই

যদি সে কাফের হয়ে থাকে তাহলে তো ঠিক আছে। অন্যথায় কাফের বলে সম্বোধনকারী কুফর এর বোঝা নিয়ে ফিরবে।

–আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল : ৮/৩৫৫

প্রশ্ন : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله বলা কেমন?

উত্তর : আপনি যদি জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত দ্বারা আলোকিত করতে পারেন সুন্নাতের সাথে আপনার সুগভীর সম্পর্ক হয়ে যায়, সকল কাজ সুন্নাত তরীকায় করার ফলে আপনার অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। আর এই মহব্বতের স্তরে উন্নতি হতে হতে তা ইশক এর পর্যায়ে পৌছে যায়। ফলে এখান থেকে মদিনা পর্যন্ত যত দূরত্ব ও অন্তরায় আছে, সবগুলো যদি আপনার সামনে থেকে উঠিয়ে দেয়া হয় এবং এখানে দাঁড়িয়েই আপনি রওজা আতহার দেখতে পান, তাহলে নিঃসংকোচে আপনি الصلاة والسلام عليك يا رسول الله পড়তে থাকুন। কারো বাধায় কর্ণপাত করবেন না। কিন্তু যদি রওজা আতহার ও আপনার মধ্যকার পর্দাগুলো না সরানো হয়, আর এখান থেকে রওজা আতহার দেখা না যায় তাহলে বুঝা যাবে 'ইশক' এর মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা রয়েছে, তাই এ অবস্থায় এখান থেকে আপনি–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

পড়তে থাকুন। ওই ভাবে বলতে হলে সফর করে মদিনা পৌছুন। মদিনা পৌছার পর রওযা আকদাসের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আদব ও ইহতিরামের সাথে কোমল স্বরে পড়বেন

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله

দূর থেকে বড়দেরকে উঁচু স্বরে ডাকাডাকি করা বে আদবী। এটা কৃষকদের স্বভাব ও রীতি। কৃষকরা একে অন্যকে জোর আওয়াজে হে- অমুক! ডাকতে থাকে। জবাবে অন্যজন বলে হ্যাঁ ভাই আমি আছি। কিন্তু বড়দেরকে এভাবে ডাকা হয় না; বড়দের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁদের

সাথে কথা বলতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (الْحُجُرَات : ٢)

'হে ঈমানগারগণ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজের সামনে তোমাদের আওয়াজকে উঁচু করো না।'

–সূরা আল হুজুরাত : ৪৯, আয়াত : ০২

সাহাবাদের মধ্যে কারো কারো আওয়াজ সৃষ্টিগতভাবে উঁচু ছিল, কথাবার্তা বলার সময় আওয়াজ বড় হয়ে যেত।

কুরআন মাজীদে আয়াত নাযিল হয়ে যেমনিভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজকে উঁচু করো না, তদ্রুপ–

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (الْحُجُرَات : ٢-٣)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এত উঁচু স্বরে কথা বলোনা তোমরা পরস্পরের মাঝে যেভাবে বলে থাক। কারণ হতে পারে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের নেক আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাদের আওয়াজকে ক্ষীণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

–সূরা আল হুজুরাত : ৪৯ আয়াত : ০২- ৩

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এতই ক্ষীণ স্বরে কথা বলতেন যে, তাদেরকে একটি বিষয় একাধিকবার জিজ্ঞাসা করা লাগত। তাঁরা এ ভয়ে আওয়াজ ক্ষীণ করেছেন না জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আওয়াজ উঁচু করার কারণে আমল নষ্ট হয়ে যায়। إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ যারা দূর থেকে উঁচু আওয়াজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকে কুরআন মজীদে তাদেরকে নির্বোধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ বলে।

সুতরাং দূরের কোন স্থান থেকে জোর আওয়াজে ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলে আহ্বানকারীকে কুরআনের ভাষায় নির্বোধ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অতএব, দূরের কোথাও দাড়িয়ে ডাকাডাকি করা, স্বর উঁচু করা এবং দূর থেকে স্কুলের বাচ্চাদের কবিতা আবৃত্তির ন্যায় এভাবে সালাত ও সালাম পাঠ করা একেবারেই ভুল পদ্ধতি। কুরআন, হাদীস কোথাও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কারো থেকেই এরূপ আমল প্রমাণিত নয়।

আপনি কোন এক কোণে বসে একাগ্রতার সাথে যতক্ষণ খুশী দরূদ শরীফ পাঠ করুন, কেউ আপনাকে বাধা দিবে না। কেউ বাধা দিলেও সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। কারণ তার ঐ কথা ওহী নয়। তাই আপনার আমল বন্ধ করবেন না।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে "ইয়া নাবী সালাতুল্লাহি আলাইকা!" ইত্যাদি যৌথভাবে উচ্চ আওয়াজে বলা একেবারেই ভুল পদ্ধতি। এর সাথে যদি এই ধারণা যুক্ত হয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি এই মিলাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন; তবে তা আরো জঘন্য ও মারাত্মক গুনাহের কাজ। বরং

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

এই দরূদ শরীফ পড়া চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অতি মুহাব্বত দেখাতে গিয়ে আক্বিদা বিশ্বাস বরবাদ করা যাবে না। আক্বিদাকে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক।

অতি উৎসাহ এবং অতিভক্তি প্রদর্শনপূর্বক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানের বিরোধী কোন কাজ সাহাবায়ে কেরাম কখনোই করেন নি। অতএব, আকীদা বিধ্বংসী কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। অতিভক্তির বশবর্তী হয়ে ইয়াহুদীরা হযরত গুয়াইব আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলে পূজা করত। খ্রীষ্টানরা পূজা করত হযরত ঈসা আ.-কে। আর মূর্তি পূজারীরা যত মূর্তি ও দেবতার পূজা অর্চনা করে, এসবই অতিভক্তি ও সীমালঙ্ঘনেরই ফল। এজন্যই ইসলাম মুহাব্বত ও ভক্তির

সীমা বির্ধারণ করে দিয়ে ঐ সীমা অতিক্রম করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং আকীদা পরিশুদ্ধ রাখা খুবই জরুরী; কারণ আকীদার বিশুদ্ধতার উপর নাজাতের ভিত্তি। ঈমানও নির্ভর করে আকিদার শুদ্ধতার উপর। আকীদা ভুল হলে ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নাজাতও মিলবে না। –মালফুযাতে মুফতী মাহমূদ হাসান সাহেব রহ., প্রধান মুফতী দারুল উলূম দেওবন্দ।

মাসআলা : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযার কাছ থেকে দরূদ শরীফ পাঠ করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনতে পান। (কেননা রওযা মুবারকে তিনি জীবিত আছেন) আর দূর থেকে যারা দরূদ পড়ে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে তাদের দরূদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়; হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি তা শুনতে পান না। হাদীস শরীফ দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। –শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস–১৫৮৩, কানযুল উম্মাল, হাদীস–২১৬৫

সুতরাং কেউ যদি এই নিয়তে الصلاة والسلام عليك يا رسول الله পড়ে যে, ফেরেস্তাগণ আমার সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে পৌঁছে দিবেন তাহলে তা বৈধ হবে।

বিষয়টি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে চিঠিতে প্রাপককে সম্বোধন করে সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহার করে এ উদ্দেশ্যে যে, ডাকযোগে আমার চিঠিটি প্রাপকের নিকট পৌঁছে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি এ নিয়তে বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি শুনতে পান, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে হাজির নাজির অর্থাৎ সবখানেই তিনি থাকেন এবং সকল এলাকার মানুষের কথা একযোগে শুনতে পান, তবে এ আকিদা শরীয়ত বিরোধী। কারণ শরীয়তের স্বত:সিদ্ধ বিধান হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হাজির নাজির নয়। তাই পূর্বোল্লিখিত আকীদা সম্পূর্ণ শিরক যা থেকে তওবা করা ফরয। সাধারণ জনগণ যেহেতু এ জাতীয় সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝে উঠতে পারে না তাই তাদের এভাবে الصلاة والسلام عليك يا رسول الله সম্বোধন করে সালাম করতে বাঁধা দেয়া জরুরী। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ৬/৭৩

মাসআলা ঃ বিপদ মুসিবতের সময় অনেকে সাহায্যের জন্য দূর থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম বা আওলিয়াগণকে ডেকে থাকে। এটিও ইসলাম বিরোধী আকিদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এই আকিদা রাখাই কুফরী, তাহলে অন্য নবী এবং ওলীদের সাথে এমন বিশ্বাস রাখা কিভাবে সহীহ হবে? দূরের যে কোন স্থান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতে পান এই আকিদা নিয়ে يا رسول الله বলে ডাক দেয়া জায়েয নেই। তবে ফেরেস্তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌছে দিবে এই আকিদার সাথে এভাবে দরূদ পাঠ জায়েয হবে। কিন্তু এতে সাধারণ জনগণ বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে, তাই এ থেকে বেঁচে থাকা চাই।

মাসআলা : নামাযের মধ্যে ايها النبى পড়া শরঈভাবে প্রমাণিত। তাই নামাযে তা পড়া জায়েয। তবে এই আকীদার সাথে পড়তে হবে যে, ফেরেস্তাগণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই দরূদ শরীফ পৌছে যাবে। —বুখারী শরীফ : ৩/২৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ৫/২৭৬, মাযাহিরে হক জাদীদ : ২/২৫৭

ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলার বিধান

মাসআলা : ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলার ব্যাপারে ব্যাখ্যা রয়েছে। কোনো কোনো অবস্থায় তা জায়েয, আবার কোনো ক্ষেত্রে নাজায়েয হয়ে যায়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওযা শরীফে জীবিত আছেন। তাই রওযা শরীফের পাশে গিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং শুনতে পান। দূরবর্তী কোন স্থান থেকে দরূদ ও সালাম পাঠ করা হলে ফেরেস্তাগণ তা দরূদ পাঠকারীর নামসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পৌছে দেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জবাব দেন এ বিষয়টি হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

উল্লেখ্য, রওযা শরীফের নিকট থেকে কিংবা দূরবর্তী কোন স্থান থেকে দরুদ পাঠের সময় সহীহ নিয়তে يا رسول الله বলা জায়েয আছে। তবে আকীদা রাখতে হবে যে, ফেরেস্তাগণের মাধ্যমে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পৌছে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার

ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সর্বশ্রোতা ও সর্বজান্তা মর্মে আকীদা পোষণ করা বৈধ নয়। তদ্রূপ নামাযের তাশাহ্হুদের মধ্যে السلام عليك ايها النبى বলে সালাম পৌছানো যাবে; এতে কোন সন্দেহ নেই। এমনিভাবে কুরআন শরীফের يايها المزمل ইবাদতের নিয়তে তিলাওয়াত করা যাবে। এতেও কোন সমস্যা নেই। এগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযের নাজের তথা সর্বদা বিদ্যমান এবং সর্বদ্রষ্টা মনে করা এবং তার পক্ষে দলিল পেশ করা নিরেট মূর্খতা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাযের নাযের মনে না করে মুহাব্বতের আতিশয্যে কিংবা চিন্তা ও পেরেশানীর মধ্যে যদি কেউ ইয়া রাসূলুল্লাহ বা অন্য কোন সম্বোধন সূচক বাক্য ব্যবহার করে তবে তা বৈধ। তদ্রূপ কবিদের ন্যায় যদি কাল্পনিকভাবে ডাকা হয় তাও জায়েয। কারণ এক্ষেত্রে হাযের নাজের হওয়ার ভ্রান্ত আকীদা থাকে না, বরং শুধুমাত্র মনের একটা আবেগ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য থাকে।

পক্ষান্তরে সালাত সালামের উদ্দেশ্য ছাড়াই যদি উঠতে বসতে হাযের নাযের হওয়ার আকীদা নিয়ে এবং প্রয়োজন পূরণে ক্ষমতাধর মনে করে ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া আলী! ইয়া গাউস! ইত্যাদি ডাকতে থাকে তবে নিঃসন্দেহে তা নাজায়েয এবং হারাম।

সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে হাযের নাযের কিংবা প্রয়োজন পূরণে ক্ষমতাবান বলে বিশ্বাস রাখা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও গোমরাহী। হাযের নাযের হওয়ার এ গুণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে খাস।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ন্যায় হাযের নাযের, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা এবং প্রয়োজন পূরণে ক্ষমতাবান হওয়ার আকীদা বিশ্বাস নিয়ে এভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া আলী! ইয়া গাউস! ডাকা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে এ আকীদা না থাকলেও অন্যদের আকীদা নষ্ট ও ভ্রান্ত হওয়ার আশংকা হলে সে ক্ষেত্রে অন্যদের সামনে এ জাতীয় বাক্য বলা নাজায়েয।

—ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৩৪৮, মিশকাত : ১/৪১,
ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৫/৯০

মাসআলা : ওলামায়ে দেওবন্দ এ আকীদা পোষণ করেন যে, রাসূলুল্ল-াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারক এর যিয়ারত সর্বোত্তম মুস্তাহাব কাজ যা ওয়াজিব এর কাছাকাছি এবং খুবই ফযীলত পূর্ণ আমল। ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, যখন মদিনা সফরের উদ্দেশ্য হবে তখন উত্তম হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা আতহার যিয়ারত এর নিয়তে সফর করা।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১/৬৬, যুবদাতুল মানাসিক এর সূত্র : ১১৩

ইয়া রাসূলুল্লাহ্ বলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা

কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট এবং অকাট্যভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো প্রমাণিত হয় :

১। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সত্তা যিনি সর্বসময়ে সর্বব্যাপী অর্থাৎ সকল মুহূর্তে দুনিয়ার সকল প্রান্তে তাঁর অবস্থান বিদ্যমান থাকে। তিনি যে শুধু বান্দাহদের ডাক শুনতে পান তাই নয়, বরং তাদের অন্তরে যে সব দু'আ নিহিত রয়েছে, অর্থাৎ মনে মনে মানুষ কি চাচ্ছে তাও তিনি শুনতে পান এবং অন্তরের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্মক অবগত।

২। সকল নবী রসূল ও অলী আউলিয়াগণ আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ। তাঁরা সকলেই মানুষ। মানুষের সীমা পেরিয়ে উপরে উঠার কোন যোগ্যতা তাঁদের মাঝে নেই। তাঁদের মাধ্যমে যে সকল মূ'জিযা ও কারামত (অলৌকিক ঘটনা) প্রকাশ পায় আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী যথা সময়েই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

৩। আল্লাহ তা'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতাকে অন্যকোন গায়রুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা সম্পূর্ণ শিরক। আল্লাহ তা'আলা শুধু আপন সত্তাগত ভাবেই একক নন, বরং তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও তিনি সম্পূর্ণ এক ও একক।

সকল মুহূর্তে সকল স্থানে বিদ্যমান ও উপস্থিত থাকা, সকল দূ'আ ও আহবান, প্রার্থনা ও ফরিয়াদ শুনে সে অনুযায়ী ফয়সালা করা তাঁরই কাজ। এই গুণ অন্য কারো মাঝে হতে পারে না। সুতরাং এ গুণকে যারা অন্যের জন্যও স্থির করবে তারা মুশরিক হয়ে যাবে।

এই তিনটি বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর অন্যকোন দলীলের ভিত্তিতে এগুলোর বিরোধী কোন আকীদা রাখা যাবে না।

অতএব, খুব ভালোভাবে বুঝে নিন যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউই হাযের নাযের নয়। ফেরেস্তাদের মধ্যস্থতা ছাড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূরদূরান্ত থেকে শুনতে পান এই আকীদার সাথে ইয়া রাসূলুল্লাহ এর শ্লোগান তোলা মারাত্মক শিরক। আল্লাহ তা'আলা হেফাযত করুন। —মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমী

হে শায়খ আব্দুল কাদের কিছু দাও

প্রশ্ন : يا شيخ عبد القادر شيئا لله 'হে শায়খ আব্দুল কাদের আল্লাহর ওসীলায় কিছু দাও' লেখা এবং অযীফা হিসেবে পড়া কেমন?

উত্তর : এ বাক্যে হযরত শায়খ আব্দুল কাদের রহ. থেকে আল্লাহর অসীলায় কিছু চাওয়া হয়। মূলত চাওয়া হয় তাঁর কাছেই, আর আল্লাহ তা'আলাকে নিছক অসীলা বানানো হয়, এ পদ্ধটি একেবারেই ভুল এবং সম্পূর্ণ উল্টা । চাওয়াতো উচিত ছিল আল্লাহ তা'আলার কাছে যিনি হলেন রাজাধিরাজ আর আল্লাহ তা'আলার কোন প্রিয় বান্দাহকে অসীলা বানাতো। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ উল্টা করা হয়েছে। এ জাতীয় শিরকী বাক্য দ্বারা আযীফা পাঠ করা সম্পূর্ণ হারাম। —ফাতাওয়া মাহমুদিয়া : ১/১৮১

মাসআলা : উপরোক্ত অযীফা পাঠ করা এবং হযরত আব্দুল কাদের রহ.-কে সকল স্থানে হাযের নাযের হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করা, আ-লিমুল গাইব তথা অদৃশ্যজান্তা ইত্যাদি মনে করা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই নাজায়েয, এধরনের বিশ্বাস হারাম এবং শিরক। কেননা এ গুণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত ও খাস। আল্লাহ পাকের গুণাবলীতে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত কারীকে ফুকাহায়ে কেরাম মুশরিক সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এ জাতীয় ভ্রান্ত অযিফার শিলালিপি মসজিদে স্থাপন করাও নাজায়েয। আর মসজিদের দেয়াল এভাবে খোদাই করা নাজায়েয এটাকে মুছে দেয়া সওয়াবের কাজ।

ইয়া শায়খ আব্দুল কাদের! এর পরিবর্তে ইয়া আরহামার রা হিমীন পড়া উচিত, যাঁর কুদরতী নিয়ন্ত্রণে স্বয়ং হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এবং গোটা বিশ্ব জাহান। তাই ভ্রান্ত আকীদার বিশ্বাসীদেরকে শরীয়তের সঠিক ও সত্য বিষয়াবলী দ্বারা বুঝিয়ে শুনিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসা চাই।

—ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ৬/৭৫, নেযামুল ফাতাওয়া : ১/৫২

يا عبد القادر شيئا لله এর অযীফা পাঠ করা এত স্পষ্ট শিরক যে এর অপরাধ হিসাবে এ শ্লোগান দাতাদেরকে ইসলামী হুকুমত মুরতাদ সাব্যস্ত করে তাদের তওবা করার সুযোগ দিবে। তওবা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

কিন্তু ভ্রান্ত পীর-মুরিদী এবং বিকৃত তাসাওউফ পদ্ধতি আল্লাহ ভক্ত সহজ সরল বান্দাহদের মস্তিস্ককে ধোলাই করে বিবেক নষ্ট করে দিয়েছে। স্মরণ রাখবে! কিয়ামতের কঠিন সময়ে যখন হিসাব নিকাশ হবে, তখন কুরআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অকাট্য ও মজবুত হাদীস সমূহের কষ্টি পাথরে আমাদের আকীদা বিশ্বাস যাচাই করা হবে। যেখানে না কোন বড় পীর সাহেব কাজে আসবে, না ছোট পীর।

হযরত শাহ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তখন পরিস্কার ভাষায় বলে দিবেন হে আল্লাহ! আমার কোনো অপরাধ নেই, আমি তো কবরে শুয়ে আছি, সারা জীবন তাওহীদ ও একত্ববাদের শিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু শয়তান তাদেরকে এভাবে বিভ্রান্ত করে যাবতীয় ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। আর অজ্ঞ ও কিছু নির্বোধ লোক শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে আমার ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতাধর, প্রয়োজন পূরণকারী এবং আরো কত ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করতে থাকে, এক্ষেত্রে আমার ত্রুটি কোথায়? আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের যা খুশি তাই করুন।

স্মর্তব্য যে, শাহ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. কেন, তার চেয়ে আরো বড় থেকে বড় কোন পীর কিংবা বুযুর্গ লোকও যদি এমন কোন কথা বা কাজ করে যা পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ বিরোধী, তবে এর জন্য তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ পাকের আদালতে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে। আম্বিয়ায়ে কেরামগণও এর ভয় ও আতঙ্ক থেকে মুক্ত থাকবেন না। —মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমী

মাসআলা : আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন কবরবাসীর নিকট সন্তান সন্ততি প্রার্থনা করা, রোগমুক্তি কামনা করা এবং রিযিক চাওয়া শিরকী কাজ।

—ফাতাওয়া রশীদিয়া : ১৪২, মাহমূদিয়া : ১/১০৮,
ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৩/৪,

মাসআলা : কবরস্থানে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দুই হাত উত্তোলন করে দু'আ করা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত; বিদআত নয়। তবে হাত না উঠিয়ে বসে বসেও দু'আ করা জায়েয আছে। কিন্তু দু'আর সময় এমন অবস্থা ও ভঙ্গি অবলম্বন করা যাবে না যে, একজন দর্শক মনে করে, সে কবরবাসীর কাছে কিছু প্রার্থনা করছে। এজন্য হাত উঠিয়ে দু'আ করার সময় কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে না। —ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৩/১০২, মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতিতে : ১/৩১৩, আলমগীরি : ৫/৩৫

মাসআলা ঃ বুযুর্গদের নামে বাচ্চাদের মাথায় চুলের ঝুঁটি বাঁধা এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর মাজার বা দরগাহে গিয়ে মাথা মুন্ডানো হারাম এবং শিরক। —ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/২০৯

মাসআলা : 'মুশকিল কুশা' বিপদ লাঘবকারী এটি আল্লাহ তা'আলার গুণ। হযরত আলী রাযি. কিংবা অন্য কাউকে এটা বলা বৈধ নয়। আর হযরত আলী রাযি.-কে কেউ কেউ মুশকিল কুশা বলে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো حل المعضلات জটিল মাসআলার সমাধানকারী-যা তাঁর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয়, যা সাধারণ জনগণ আকীদা পোষণ করে থাকে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি কঠিন থেকে কঠিন বিচার কার্য এবং লেনদেনকে খুব সহজে সমাধান করতে পারেন। এই অর্থে এর ব্যবহার সহীহ আছে। —নেযামুল ফাতাওয়া : ১/৮৮

মাসআলা : হযরত আলী রাযি.-কে يا على مشكل كشا বলে সম্বোধন করা এবং এ আকীদা রাখা যে এর দ্বারা সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, এটা সম্পূর্ণ ভুল এবং কুফরীর সদৃশ গুনাহ। এ থেকে তওবা করা এবং এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। —ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৪/৮১

আওলিয়ায়ে কেরামকে প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা

বহু মানুষ আওলিয়ায়ে কেরামগণকে প্রয়োজন পূরাকারী, সমস্যা সমাধানকারী এবং বিপদ দূরকারী বলে বিশ্বাস করে, আর এ উদ্দেশ্যে ফাতেহা ও নযরানা পেশ করে থাকে এবং এগুলোর দ্বারা এ নিয়ত করে যে, এর মাধ্যমে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, সন্তান ও সম্পদের প্রবৃদ্ধি, রিযিক বৃদ্ধি এবং সন্তানদের বয়স বৃদ্ধি পাবে। সকল মুসলমানকে এ

জাতীয় শিরকী আকিদা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এজাতীয় আকীদার ভ্রান্তি কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকে গায়ের জোরে এই অপব্যাখ্যা করে যে, সর্বময় ক্ষমতাধর আলিমুল গায়ব, তথা অদৃশ্য বিষয়ে সর্বজ্ঞাত হিসেবে আমরা আল্লাহ তা'আলাকেই বিশ্বাস করি, তবে বুযুর্গদেরকে অসীলা বানানো তো বৈধ আছে।

এর জবাব হলো কাউকে অসীলা বানানোর উদ্দেশ্য এই নয় যে, ঐ ব্যক্তিই উদ্দিষ্ট বিষয় সমাধানে কোন ক্ষমতা রাখে। সুতরাং অসীলাকৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য সাধনকারী মনে করা, কিংবা এই মনে করা যে, মূল ক্ষমতাতো আল্লাহরই তবে এসকল বুযুর্গ কর্তৃক আল্লাহর দরবারে সুপারিশের কারণে ঐ কাজ করতে আল্লাহ তা'আলা বাধ্য থাকেন, এ জাতীয় বিশ্বাস সম্পূর্ণ শিরক। আরবের মুশরিকদের আকীদা বিশ্বাস এমনই ছিল। তারাও তাদের মূর্তি ও দেবতাদেরকে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং পূর্ণ ক্ষমতাধর বলে মনে করত না, বরং আল্লাহর ক্ষমতার পাশাপাশি এদেরও ক্ষমতা আছে বলে মনে করত। আল কুরআনুল কারীমে তাদের এ অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ .

অর্থাৎ– আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, বলো তো নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল কে সৃষ্টি করেছেন? তারা বলবে " আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন।"

–সূরা আল আনকাবূত : ২৯, আয়াত : ৬১

এখানে একটি মৌলিক কথা জেনে নেয়া চাই- তাহলো কারো নিকট কোন বিষয়ের আকাঙ্খা করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে একত্রিত হওয়া আবশ্যক।

প্রথমত : যার কাছে সমাধান চাওয়া হবে ঐ বিষয়টি সম্পূর্ণ তার জানা থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত : তার কাছে কাঙ্খিত বিষয়টি মজুদ থাকতে হবে।

তৃতীয়ত : ঐ জিনিসটা দেয়ার মত তার ক্ষমতা থাকতে হবে।

চতুর্থত : তাকে বারণ করার মত তার চেয়ে বড় কেউ না থাকতে হবে।

পঞ্চমত : প্রার্থির নিকট প্রার্থিত বিষয় পৌছে দেয়ার মত উপায় উপকরণ তার কাছে থাকতে হবে।

এবার চিন্তা করে বলুন, যে ব্যক্তি কোন বুযুর্গের নিকট সন্তান সন্ততি কিংবা জীবিকা প্রার্থনা করে, ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে,

প্রথমত : তোমার এসব প্রয়োজনের ব্যাপারে বুযূর্গগণ কিভাবে অবগত হয়েছেন ? যদি সে বলে যে আল্লাহ্ তা'আলার ওলীগণ সর্ব বিষয় সম্পর্কে সম্মক জ্ঞাত, তবে তা তো সুস্পষ্ট শিরক। আর যদি বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দেন তবে তা অসম্ভব না হলেও বাস্তবেই তা হওয়া জরুরী নয়। কেননা শরঈ দলীল প্রমাণ ব্যতীত সম্ভাব্য কোন বিষয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

অর্থ : যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।

–সূরা বনী ইসরাঈল : ১৭, আয়াত : ৩৬

এরপর কথা হচ্ছে এসব বুযূর্গ ও আওলিয়াদের নিকট জীবিকা ও সন্তান সন্ততি জমা রাখা হয়েছে কোথায়? তাঁদের কাছে নিয়ামতের যে প্রাচুর্য দেখা যায় তার হিসাব ভিন্ন, এগুলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু জীবিকা ও সন্তান সন্ততিতো তাদের নিকট স্তুপ করে রাখা হয় নি। সুতরাং এগুলো প্রদানে তাদেরকে যদি পূর্ণ ক্ষমতাবান মনে করা হয় তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ শিরক। আর যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমতা দান করেছেন, তবে এ বিশ্বাসের পক্ষে অবশ্যই শরঈ দলিল পেশ করতে হবে। বিনা দলিলে এ জাতীয় বিশ্বাস রাখা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যারোপের শামিল। কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি আমার ব্যাপারে কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়ে কোন ক্ষমতা রাখি না। –সূরা আল আ'রাফ : ৭, আয়াত : ১৮৮

এ আয়াতের মাধ্যমে গায়রুল্লাহ থেকে এ জাতীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ

তা'আলা যা করতে চান তাই হয়ে যায় এ জাতীয় কাজ থেকে তিনি প্রতিহত করবেন না এটা কিভাবে নিশ্চিত হলে? সুতরাং কেউ যদি আওলিয়াদের ব্যাপারে এ ধারণা রাখে যে, তাঁরা যা চান তাই করতে পারেন, সে পূর্ণ কুরআনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

এরপর এসব উদ্দেশ্যাবলী পূরনের মাধ্যমগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তোমাকে সন্তান কিভাবে দিয়েছে এবং কিভাবে তোমার কাছে পৌঁছিয়েছে? এসব প্রশ্নের জবাবে যদি বলে যে, কবরবাসী বুযূর্গগণ দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন এবং প্রার্থিত বস্তু হুবহু প্রদান করেন।

এর জবাব হলো, দু'আ করার জন্য প্রথমত ঐ বিষয় সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবগতি জরুরী, আর এ বিষয়ে তাদের কোন দলিল নেই। যদি ধরেই নেয়া হয় যে, তিনি অবগত হতে পেরেছেন তবে এর কী প্রমাণ আছে যে, তিনি দু'আ করেই দেন? দু'আ করা মাত্রই তা কবুল হওয়ারও বা কী দলীল আছে? মোট কথা ওসীলা বানানোর বাস্তব উদ্দেশ্য এগুলোর কোনটিই নয়।

পক্ষান্তরে, হে আমার প্রতিপালক! অমুক মকবূল বান্দাহর ওসীলায় আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করে দিন। যেমনিভাবে হযরত উমর রাযি. হযরত আব্বাস রাযি.-এর ওসীলায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছেন। এ জাতীয় ওসীলা গ্রহণ নিঃসন্দেহে জায়েয ও বৈধ।

স্মরণ রাখা চাই! যে সব বৈশিষ্ট্য গুণাবলী ও পূর্ণতা আল্লাহর সাথে আকলী ও দলীল ভিত্তিক প্রমাণিত, গাইরুলাহর ব্যাপারে ঐ সব গুণাবলী ও পূর্ণতার আকীদা পোষণ করা শিরকে ই'তিকাদী বা বিশ্বাসগত শিরক।

আর আল্লাহর সাথে বিশিষ্ট মু'আমালাত ও কার্যাবলীতে গাইরুল্লাহকে শরীক করা 'শিরক ফিল আমল' বা কর্মে শিরক।

এই মূলনীতি অনুসরণের মাধ্যমে ইনশা আল্লাহ কোন মুসিবতের শিকার হতে হবে না।

–ইসলাহুররুসূম

বুযূর্গগণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা

মাসআলা : বর্তমানে মুসলমানদের আকীদা ভ্রান্ত হয়ে গেছে। ব্যাপক ভাবে অমুসলিমদের আকীদার ন্যায় তারাও বুযূর্গগণকে সর্বময় ক্ষমতাধর মনে করে। এটা কত বড় অন্যায়! বিশেষভাবে জেনে নেয়া চাই যে, কোন বুযূর্গকে বান্দাহ বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তার সাথে যদি আল্লাহর ন্যায় মু'আমালা ও চালচলন করে তবে তা-ও শিরক এর অন্তর্ভূক্ত।

–আনফাসে ঈসা : ৫৫২

মাসআলা : কোন বুযূর্গ এর ব্যাপারে এ মর্মে আকীদা বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন যোগ্যতা দিয়েছেন যার সুবাদে তিনি যখন যা খুশি করতে পারেন এতে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার প্রয়োজন নেই। এ জাতীয় বিশ্বাস পোষণ করা সম্পূর্ণ শিরক।

মাসআলা : অনেক অসুস্থ কিংবা তাদের সংশ্লিষ্টরা মৃত বুযূর্গ এর নামে খানা পাক করে গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেয় এবং এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, ঐ বুযূর্গ খুশী হয়ে কিছু সাহায্য করবেন বলে। এই আকিদাটিও স্পষ্ট শিরক।

মাসআলা : কেউ কেউ বুযূর্গদের সাহায্যের পরিবর্তে তাদের দু'আর আশা রাখে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তাঁদের দু'আ বিফল যায় না। এরূপ বিশ্বাস পোষণ করাও শরীয়ত বিরোধী। –আগলাতুল আওয়াম : ২৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হাযির নাযির মনে করা

প্রশ্ন : যায়দ এই আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন ক্ষমতা দান করেছেন যার মাধ্যমে তিনি যখন যেখানে খুশি আল্লাহর হুকুমে উপস্থিত হতে পারেন। যায়দ দাবী করে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাযির নাযির বলে বিশ্বাস করি। কেউ কেউ বলেন, যায়দ এর পেছনে নামায বৈধ নয়। বিষয়টি স্পষ্ট করুন। আর যায়দ মুসলমান হিসেবে অবশিষ্ট আছে কিনা? জানাবেন।

উত্তর : আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যা অন্য কাউকে দান করেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পৌছে দিতে পারেন এবং যে কোন বিষয় ইচ্ছা তাঁকে জানিয়ে ও দিতে পারেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য হাযের নাযের গুণ দুটি প্রমাণিত হয় না। কারণ হাযের নাযের ঐ সত্তার গুণ হয়, যিনি কারো সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই সর্বত্র সর্বসময়ে এবং সর্ব বিষয়ে হাযের নাযের থাকেন। এই গুণটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথেই খাস। যায়দ যে ব্যাখ্যা পেশ করে এভাবে তো আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য গুণাবলীও গাইরুলাহর জন্য প্রমাণ করা যাবে। এর মাধ্যমে আকীদার ভ্রষ্টতার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তবে উক্ত ব্যাখ্যার কারণে যায়দ এর ব্যাপারে কুফর কিংবা মুরতাদ হওয়ার বিধান আরোপ করা যাবে না। কিন্তু এভাবে ব্যাপকতার সাথে বলা গোমরাহীর কারণ। তাই এ জাতীয় ভ্রান্ত আকীদা থেকে যায়দকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে। এ থেকে না ফিরা পর্যন্ত তাকে ইমাম বানানো যাবে না। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৫/১০৮

মাসআলা : ইলমুল গায়ব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনি সর্বত্র উপস্থিত থাকেন এবং সবকিছু দেখতে পান। এ বিষয়গুলো আল্লাহ পাকের সত্তার সাথে বিশিষ্ট গুণাবলী। কোন নবী-ওলী বা ফেরেস্তা এসব গুণে অংশীদার নন। সুতরাং কাউকে এসব গুণে অংশীদার বলে মনে করা সম্পূর্ণ শিরক। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১০/২১

মাসআলা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলিমুল গায়ব তথা অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁকে হাযির নাযির মনে করা শিরকী আকীদা। যে ব্যক্তি এরূপ আকীদা পোষণ করে তাকে অতি শীঘ্রই তওবা করতে হবে। অন্যথায় তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি। –নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১৯৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষ ছিলেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ ছিলেন এ বিষয়টি কুরআন মাজীদ এবং অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়টিকে অস্বীকারকারী কুরআন ও হাদীসের অস্বীকারকারী বলে বিবেচিত হবে। কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানুষ হওয়ার বিয়ষটি অস্বীকার করে, অথচ কুরআনে হাকীমের বহু জায়গায় রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানুষ হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি উম্মতের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে যেন তারা বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারে এবং খৃষ্টানদের ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্রষ্টা হিসেবে স্থির করে গোমরাহীতে লিপ্ত না হয়।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

অর্থ ঃ হে রসূল! আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। –সূরা কাহাফ ১৮ : ১১০

কুরআনে কারীমের বহু স্থানে এ মর্মে বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

✪ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাতে ইমামতি করছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর নামাযে ভুল হয়ে যায়, নামায শেষে তিনি বললেন, "আমিও তো একজন মানুষই। তোমরা যেভাবে ভুলে যাও, আমিও ভুলে যাই। যখন আমি ভুলে যাব তোমরা আমাকে (লোকমা দিয়ে) স্মরণ করিয়ে দিবে।" –মিশকাত : ২/২৭৯

কুরআনে কারীমের আয়াত, অসংখ্য সহীহ হাদীস এবং বুযূর্গানে দ্বীনের মতামতের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ ছিলেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ হওয়ার আকীদা পোষণকারীদেরকে কাফের এবং ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেছে মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি এবং গোমরাহী। বরং বাগদাদের মুফতী আল্লামা আলুসী রহ. তার তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এই ফাতওয়া উদ্ধৃত করেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষ বলে অস্বীকার করে আমি তাকে কাফের বলে স্থির করি। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষ বলে জানা এবং আকীদা পোষণ করা ঈমানের বিশুদ্ধতার অন্যতম শর্ত। –তাফসীরে রূহুল মা'আনী : ২/১০১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ ছিলেন। তবে সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিক উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন, পরিপূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন, পবিত্র ও বিশুদ্ধ ছিলেন । যেমনিভাবে তাঁকে মানুষ হিসেবে বিশ্বাস

করা ঈমানের অন্যতম অংশ, তদ্রূপ তাঁকে অন্যান্য মানুষের তুলনায় উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র বলে আকীদা রাখাও জরুরী।

–বুখারী শরীফ : ২/২৩২, ২/১০৬২, আইনী শরহে বুখারী : ১/২৫৭, শরহু মা'আনিল আছার : ১/২৮৭, আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৫৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৩৯৫,

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি সালাম পেশ করার সময় তিনি মজলিসে আগমন করেন বলে আকীদা রাখা

প্রশ্ন : কোন কোন মসজিদে জুমআ এবং অন্যান্য নামাযের পর يانبي سلام عليك يا رسول سلام عليك ইত্যাদি বাক্যগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়া হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দিত হয়ে এর জবাব দেন এবং উক্ত মজলিসে আগমন করেন এ বিশ্বাসও পোষণ করা হয়। আর যারা এতে অংশ গ্রহণ করে না, বিভিন্ন ভাবে তাদের বদনাম করা হয়। মসজিদে এভাবে সালাম পড়া ঠিক কিনা?

উত্তর : এ কাজটি জঘন্যতম অন্যায়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মজলিসে আগমন করার এই আকীদা সম্পূর্ণ শিরক। সুতরাং এ কাজটাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা, এ কুপ্রথা ও বিশ্বাসকে দূর করা এবং এ জাতীয় কুপ্রথা থেকে সমাজ সংশোধন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্তব্য। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের উপর এ দায়িত্ব বিশেষভাবে আরোপিত হয়। মসজিদের মুতাওয়াল্লী, কমিটির সদস্যদের উপরও এ দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, তারা এ জাতীয় কুসংস্কার ও বিদআত সমূহ মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর হবেন। মসজিদের ন্যায় মসজিদের বাইরেও এসব কাজ নিষিদ্ধ। উক্ত পদ্ধতিতে একত্রিত হয়ে সালাম পাঠ করা দাঁড়িয়ে হোক বা বসে, সবগুলোর বিধান একই।

–নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১৯২

মাসআলা : হাযির নাযির তথা সর্ব ক্ষেত্রে উপস্থিত এবং সর্বদ্রষ্টা এটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাযের নাযের মনে করা সম্পূর্ণ শিরক। এ ধরনের ভ্রান্ত আকীদা থেকে তওবা করা একান্ত আবশ্যক। এ ধরনের আকীদা পোষণকারী আমলের গুণাহের সাথে সাথে ভ্রান্ত আকীদায় লিপ্ত। আর যে ব্যক্তি এই ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করা ছাড়াই এ কাজে লিপ্ত সেও গুনাহগার হবে।

–নেযামুল ফাতাওয়া : ১/২৯৩

মাসআলা : আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ হাযির নাযির নয়। গায়রুল্লাহর জন্য এ গুণ স্থির করা শিরক। এটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এই আকীদা পোষণ করা যে, যখন যেখানেই দরূদ শরীফ পাঠ করা হয় সেখানেই তিনি আগমন করেন, এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমানিত করা হয়। বরং সহীহ হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে দুনিয়ার যে প্রান্তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, আল্লাহ তা'আলার ফেরেস্তাগণ দরূদ পাঠকারীর নাম ও পিতার নামসহ তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা আতহারে পৌঁছিয়ে দেন।

–নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১৯৫, কেফায়াতুল মুফতী : ১/১৫৬

বিতর্ক অনুষ্ঠানে কুফরী কালাম বলা

প্রশ্ন : বিতর্ক অনুষ্ঠানে দু'জন বাচ্চার একজন নিজেকে কাফের হিসেবে প্রকাশ করে। যদিও আকিদা কুফরী নয়; বরং মজলিসে চিত্তাকর্ষণ কিংবা শিক্ষা লাভের জন্য এমনটি করে থাকে। কাফের পরিচয় দাতা বলে, আমি আল্লাহর একাত্মবাদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস মূর্খতা, ইত্যাদি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে। উত্তরদাতা ঐ ছেলেকে হে কাফেরের বাচ্চা! মরদূদ! ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে। এ জাতীয় বিতর্ক অনুষ্ঠান জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোন নাস্তিক কিংবা ইসলাম বিদ্বেষীদের কোন কুফরী কালাম বা কুফরী আকীদা উদ্ধৃত করা যায় এভাবে যে, অমুক ব্যক্তি এমনটি বলে, অমুকের আকীদা এই।

তদ্রূপ কারো কোন বক্তব্য বা আকীদার ব্যাপারে শরঈ বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে এরূপ বলা যায় যে, এমনটি বলা কুফর। এমনটি বলা কুফর নয়। এমনিভাবে (اکراہ) জীবনের ঝুঁকি এসে পড়লে এবং কঠিন ভয়ের সময় অনন্যোপায় হয়ে পড়লে অন্তরে ঈমান পাকাপোক্ত রেখে শুধু মৌখিকভাবে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করার অনুমতি রয়েছে। –সূরা নাহল ১৬ : ১০৬

এছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে হাসি তামাশা ও রসিকতামূলক কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা, ঢং ও স্টাইলের জন্য কাফের ও ফাসেকদের পোষাক

পরিধান করা, প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে নিজেকে অমুসলিম বলে পরিচয় দেয়া যদিও আকীদা বাস্তব দাবীর অনুরূপ নয়, তথাপি এসব কাজ না জায়েয এবং হারাম। কোন কোন ক্ষেত্রে কুফরীর সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

মাসআলা : কুফরী আকীদা পোষণ না করা সত্ত্বেও মৌখিকভাবে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা কুফরী। —মাজমূআয়ে ফাতাওয়া : ২/৩৬০

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ রহ. বলেন, অন্তরে কুফরী আকীদা না থাকলেও মৌখিকভাবে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা হারাম এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের যোগ্য অপরাধ। যেমনিভাবে কেউ তোমাকে গাধা শুকর কিংবা অন্য কোন খারাপ নাপাক জিনিস বলে গালি দিল, ঐ লোক আন্তরিকভাবে এ বিশ্বাস রাখে না যে, বাস্তবেই তুমি গাধা, শুকর বা অন্য কোন নাপাক বস্তু যা বলে গালি দিয়েছে; বরং এটি নিছক তার মৌখিক গালি সর্বস্ব। বলো তো! ঐ গালি শুনে তোমার ক্রোধ হবে কিনা? অবশ্যই তোমার ক্রোধ আসবে। ঠিক একইভাবে বুঝে নাও যে, কুফরী বাক্যসমূহও আল্লাহ পাকের ক্রোধের কারণ হয়।

সর্বোপরি উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিতর্ক করা জায়েয নয়। এটি অবশ্যই বর্জণীয়। শিক্ষা দেয়া বা সংশোধন করা এ পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং শিক্ষার জন্য আরো বহু সঠিক পদ্ধতি রয়েছে।

—ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১/৪৩, তাযকিরাতুর রশীদ : ১/৯৪

মাসআলা : বাতেল ও গোমরাহ ফেরকাদের সাথে মুনাযারা বা বিতর্ক শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে কোন ছাত্র নিজেকে বাতেল ফেরকার সদস্য হিসেবে প্রকাশ করা এবং আহলে হককে গোমরাহ ও কাফের সাব্যস্ত করা মোটেও বৈধ নয়, কঠিন গুনাহের কাজ। এর কারণে ঈমান চলে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কুফরের স্বীকৃতি এবং মৌখিক উচ্চারণ উভয়টাই কুফরী; যদিও ই'তিকাদ বা বিশ্বাস না হোক, ঠাট্টার ছলে হোক। ফুকাহায়ে কেরাম এগুলোকেও কুফরের কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অতএব মুনাযারার পদ্ধতি এভাবে ঠিক করবে যে, ঐ বাতেল গ্রুপের পক্ষ থেকে একজন বলবে, যদি কাদিয়ানী এরূপ বলে তবে এর কী জবাব আপনার কাছে আছে? যদি রেযাখানী এই বলে তার জবাব কী হবে?

কুফরী বাক্য নিজের মুখ থেকে নিজের বাক্য হিসেবে কখনোই প্রকাশ করবেনা; যদিও তা বানোয়াট ওকালতীর নিয়তে হোক। সে উদ্দেশ্যেও কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা অন্যায় এবং অতিশীঘ্রই তা প্রত্যাহার করা আবশ্যক। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৮/১২৪

নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিতে অস্বীকার করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি নামায রোযা পালন করা সত্ত্বেও যদি ঘোষণা দেয় যে, আমি মুসলমান নই, তবে তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা হবে কিনা?

উত্তর : এরূপ দাবী করা এবং এ জাতীয় কথা বলা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। উক্ত ব্যক্তি অবশ্যই তওবা করে কালেমা পড়ে নিবে এবং সতর্কতামূলক বিবাহ নবায়ন করে নিবে।

তবে যদি নিজের ঈমানকে দূর্বল মনে করে এমনটি বলে আর আল্লাহ পাকের ওয়াদা সমূহের উপর মুসলমানদের যেরূপ ইয়াকীন ও বিশ্বাস থাকা উচিত, তাঁর বিধি-বিধানের উপর যেভাবে অটল অবিচল থাকা আবশ্যক সে ধরনের ইয়াকীন বিশ্বাস ও অবিচলতা তার মধ্যে না থাকার কারণে আক্ষেপ ও আফসোস করে এভাবে বলে আর এর মাধ্যমে সে আল্লাহ পাকের নিকট সুদৃঢ় ও মজবুত ঈমানের আকাঙ্খা পোষণ করে তাহলে উক্ত ব্যক্তির ঈমান নবায়নের বিধান প্রয়োগ করা হবে না; বরং তার অনুভূতি ও আক্ষেপ প্রশংসিত হবে। তবে এরূপ বলা থেকেও বারণ করতে হবে।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/১২০

স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেকে অমুসলিম পরিচয় দেয়া

প্রশ্ন : রমাযানুল মুবারকে দিনের বেলায় অমুসলিমদের হোটেল খোলা থাকে। এতে অমুসলিমদের পাশাপাশি কিছু মুসলমান বেরোজদারীরাও খেতে আসে। কখনো পুলিশী অভিযানে কোন মুসলমান ধরা পড়ার পর যদি সে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য নিজেকে অমুসলিম হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলে আমি মুসলমান নই। এ ক্ষেত্রে নিজেকে অমুসলিম পরিচয় দেয়া ঠিক হবে কিনা?

উত্তর : 'আমি মুসলমান নই', বাক্যটি বলার দ্বারা একজন লোক দ্বীন ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ে। মুসলমান থাকে না। এ জাতীয় লোকদের ঈমান ও বিবাহ দোহরায়ে নেয়া জরুরী এবং এ জাতীয় নিকৃষ্ট কথাবার্তা থেকে তওবা করা আবশ্যক। রোযা না রাখার আরো অন্যান্য কারণওতো রয়েছে। কারো যদি মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয় তবে অন্য কোন ওযর পেশ করবে; তবুও নিজেকে অমুসলিম বলবে না। এটি একেবারেই নির্বুদ্ধিতা।

–আপকে মাসায়েল : ১/৫১

সি.আই.ডি নিজেকে অমুসলিম বানানো

প্রশ্ন ১ : যায়দ একজন অভিনেতা, বিভিন্ন সময়ে নিজের বেশ ভূষা পরিবর্তন করে বহুরূপ ধারণ করে। এতে অনেক সময় তাকে হিন্দু বলেই মনে হয়। সে মাথায় তিলক পরে, গলায় মালা ঝুলায় ইত্যাদি। এসব কাজের পাশাপাশি নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় এবং মুসলমান হওয়ার আশা পোষণ করে। এ অবস্থায় তার মুসলমান হিসেবে থাকা এবং বিবাহ বহাল থাকার ক্ষেত্রে নিয়তের বিধান কি?

প্রশ্ন ২ : বকর সি.আই.ডিতে চাকুরী করে। নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে কোন পলাতক আসামী কিংবা অপরাধীকে ধরার জন্য এমন বেশভূষা অবলম্বন করতে হয় যে তাকে মুসলমান বলেই মনে হয় না, বরং অমুসলমান হিসেবে নিশ্চিত বুঝে আসে। যদিও মৌখিকভাবে সে নিজেকে অমুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। এক্ষেত্রে তার ইসলাম ও বিবাহের বিধান কী?

উত্তর : ১ বিশেষ প্রয়োজনে অনন্যোপায় না হলে অমুসলিমদের বিশেষ পোষাক পরিধান করা নিষিদ্ধ ও অবৈধ। তিলক অমুসলিমদের ধর্মীয় ইউনিফর্ম; তাই এগুলো পরার দ্বারা একজন ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। আর নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়াও কুফরী কাজ। উক্ত ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাওয়ায় তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গেলে তার মুসলমান অবস্থার স্ত্রী এখন নতুন ভাবে হালালা ছাড়াই বিয়ের মাধ্যমে বৈধ হবে।

উত্তর : ২ যদি কাফেরদের সাম্প্রদায়িক পোষাক পরিধান করে তাহলে এর দ্বারা কুফরী আবশ্যক হবে না; তবে গুনাহ্ হবে। কিন্তু যদি তাদের ধর্মীয় ইউনিফর্ম ও পরিচয়মূলক চিহ্নগুলো অবলম্বন করে তবে তা কুফরী হবে।

—ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ৬/১১৪,
আলমগীরী : ২/৮৯৪, কাযীখান : ৪/৬০৭,
ফাতাওয়া শামী : ২/৬৪৩

নেশাকারীর বিধান

মাসআলা : মদ পানের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ঈমান চলে যায় না, বরং কুফরের কারণে ঈমান চলে যায়। তবে মদপান করা কবীরা গুনাহ। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি মুসলমান থাকবে। তাই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলেও তার জানাযা নামায পড়তে হবে। তবে এ জাতীয় গুনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের ধমক ও নিন্দাজ্ঞাপনের লক্ষ্যে সমাজের অনুসরণীয় আলেম, এবং জামে মসজিদের ইমাম তার জানাযা পড়াবেন না, বরং সাধারণ মুসলমানরা তার জানাযা পড়ে দাফন করে দিবে। জানাযা না পড়িয়ে দাফন করে দিলে সকলেই গুনাহগার হবে।

মাসআলা : ডাকাতির কারণেও ঈমান যায় না। তাই উক্ত ব্যক্তি মুসলমান হিসেবেই বহাল থাকবে। যদিও উক্ত কাজের জন্য অবশ্যই গুনাহগার হবে। তবে ডাকাতকে ডাকাতি অবস্থায় হত্যা করা হলে তার জানাযা নামায পড়তে হবে না। অবশ্য গ্রেফতার হওয়ার পর হত্যা করা হলে জানাযা পড়তে হবে।

মাসআলা : ব্যভিচারের মুহূর্তে কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার বিধানও মদখোরের বিধানের ন্যায় যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

—ইমদাদুল আহকাম : ১/১১৭,আইনুল হেদায়া : ৪/২৮৬

আলেমগণকে গালি দেয়ার বিধান

মাসআলা : কোন নির্দিষ্ট আলেমকে গালি দেয়ার দ্বারা কুফর সাব্যস্ত হয় না। আর মোনাজারা ও বিতর্কের সময় সাধারণত ওলামাদের সম্বোধন করা হয়। তখন সম্বোধিত ব্যক্তিই উদ্দেশ্য থাকে। অতএব কুফর এর বিধান প্রয়োগ করা যাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উলামাগণকে গালি দেয় সে মুসলমানদের থেকে সামাজিক অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি তওবা না করা পর্যন্ত তার সাথে উঠা বসা,

কথাবার্তা, লেনদেন, আদান-প্রদান এসব বর্জন করা এবং তাকে সামাজিক াবে বয়কট করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। –ইমদাদুল আহকাম : ১/১১৮

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালি দেয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়। পরবর্তীতে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলে ওঠে যে, স্ত্রীকে ধমক দেয়ার লক্ষ্যে এমনটি করেছে। উক্ত ব্যক্তির বিধান কী?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বেঈমান হয়ে গেছে এবং তার স্ত্রী তার বিবাহবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ব্যক্তির জন্য নতুন ভাবে ঈমান আনয়ন পূর্বক বিবাহ নবায়ন করা আবশ্যক। যদি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সরকার থাকতো তবে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো; কিন্তু ইসলামী হুকুমত না থাকায় ওই শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। তবে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঈমান ও বিবাহ নবায়ন করানো জরুরী। –নেষামুল ফাতাওয়া : ১/৫৩

রোযা নিয়ে ঠাট্টা করা

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই কামিয়াবি ও সফলতা। অনেক মূর্খব্যক্তি রোযা না রেখেই ক্ষান্ত থাকে; কিন্তু বহু বদদীনলোক মুখে বিভিন্ন প্রকার কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে। যেমন : যার ঘরে খানা নেই সে-ই রোযা রাখে, আমাদেরকে ক্ষুধায় মেরে আল্লাহর কী লাভ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এ জাতীয় বাক্য ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং অত্যন্ত সচেতনতার সাথে একটা মাসআলা বুঝে নেয়া আবশ্যক যে, দ্বীনের ছোট থেকে ছোট কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা, বিদ্রুপ করা কুফর এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেউ যদি সারাজীবন রোযা নামায না করে, কিংবা অন্য কোন ফরয ইবাদত সম্পাদন না করে তবে এগুলোকে অস্বীকার না করলে সে কাফের হবে না। যে ফরয বিধান সে আদায় করবে না তার জন্য গুনাহ হবে এবং শাস্তি ভোগ করবে। আর যে আমল সম্পাদন করবে তার বিনিময়ে প্রতিদান লাভ করবে। কিন্তু দ্বীনের ছোট থেকে ছোট কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা সম্পূর্ণ কুফরী। এর কারণে জীবনের সকল নেক আমল যেমন– নামায, রোযা এবং অন্যান্য পূণ্যের কাজ নষ্ট হয়ে যায়। এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। সুতরাং রোযা সম্পর্কে এ জাতীয় কোন বাক্য কখনোই বলা যাবে না এবং ঠাট্টা বিদ্রুপও করা যাবে না।

মাসআলা : যে ব্যক্তি জেনে শুনে নামায ছেড়ে দেয় কিন্তু সে নামায নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে না, তবে হানাফীদের মতে উক্ত ব্যক্তি কাফের হবে না; বরং ফাসেক বলে বিবেচিত হবে। তার শাস্তি হচ্ছে (যদি ইসলামী হুকুমত থাকে) তাকে এমনভাবে প্রহার করা হবে যাতে শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। এরপর তাকে বন্দী করে রাখা হবে। হয় সে তওবা করবে, নতুবা কয়েদী অবস্থায় তার মৃত্যু হবে।

আল্লাহ তা'আলার শানে বেয়াদবী

মাসআলা : আল্লাহ তা'আলার শানে সামান্যতম বেয়াদবীর কারণেই ঈমান চলে যায়। তাঁকে গালিগালাজ করা তো আরও মারাত্মক ব্যাপার। এর কারণে মারাত্মক গুনাহ এবং কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, এ জাতীয় ব্যক্তির ঈমান এবং বিবাহ নবায়ন করা আবশ্যক।

—নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১২৫

নামায নিয়ে ঠাট্টা করা

প্রশ্ন : কেউ যদি এভাবে বলে যে, যার ঘরে আটা বা খাদ্যদ্রব্য নেই সে-ই রোযা রাখে, নামাযের মধ্যে উঠবস করে কে? বা এজাতীয় কোন কুফরী বাক্য বলে তবে এর দ্বারা উক্ত ব্যক্তির ঈমান চলে যাবে কিনা?

উত্তর : দ্বীনের কোন ইবাদত বা অন্য কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা কুফরী। উক্ত ব্যক্তিকে তার কুফরী বাক্যগুলো থেকে তওবা করত কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে ঈমান নবায়ন করতে হবে, এবং বিবাহ নতুন ভাবে পড়াতে হবে। যদি তওবা না করে এবং বিবাহ না দোহরায়ে স্ত্রী সঙ্গম করে তবে ব্যভিচারের গুনাহসহ ডাবল গুনাহগার হবে।

—আপকে মাসায়েল : ১/৫০

মাসআলা : আমি তোমার কুরআন শরীফে পেশাব করি। এ কথা বলার কারণে স্ত্রী মুরতাদ হয়ে গেছে এবং বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে যদি তওবা করে তাহলে ঈমান আনার পর স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে।

—আপকে মাসায়েল : ৮/৪৬৩,
নেযামুল ফাতাওয়া : ১/৪৮

দ্বীনের আবশ্যক বিষয় সমূহ নিয়ে ঠাট্টা করা

মাসআলা : হাদীস অস্বীকারকারীদেরকে মুনকিরীনে হাদীস বলা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক তেমনি মুতাওয়াতির, যেমন মুতাওয়াতির কুরআনে কারীম। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায অস্বীকার করে, সে কুরআনের অস্বীকারকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দ্বীন ইসলামেরও অস্বীকারকারী।

এমনিভাবে দ্বীনের যে সব বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দৃঢ়তা ও তাওয়াতুরের সাথে প্রমাণিত এবং যে গুলো দ্বীনে মুহাম্মদীর আবশ্যক বিষয় হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ ও বিশিষ্টজন সকলের নিকট স্পষ্ট, এগুলোকে জরুরিয়াতে দ্বীন বলা হয়। এসব বিষয়কে নির্দ্বিধায় বিনা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে মেনে নেয়া ইসলামের অন্যতম শর্ত। এগুলোর কোন একটি অস্বীকার করা বা সে গুলোর কোন অপব্যাখ্যা করা কুফরী। অতএব যে গ্রুপ নামায শুধু তিন ওয়াক্ত বলে থাকে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানে না; তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। —আপকে মাসায়েল : ১/৪৯

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. গণকে নিয়ে উপহাস করা

মাসআলা : কোন সাহাবিকে নিয়ে উপহাসকারী নিকৃষ্ট মানের পাপিষ্ঠ। এ জাতীয় ঘৃণিত কাজ থেকে তওবা করা আবশ্যক। অন্যথায় তার মৃত্যুকালীন অবস্থা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও লাঞ্ছনাকর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর যারা কয়েকজন সাহাবী ব্যতীত বাকীদেরকে গোমরাহ মনে করে, তাঁদেরকে উপহাস ও ঠাট্টা করে, তারা কাফের এবং ধর্মচ্যুত। কেউ যদি এভাবে বলে যে, আমি অমুক সাহাবীর হাদীস মানি না। (নাউযুবিল্লাহ) তবে কোন সাহাবীর হাদীস কবুল না করা ঐ সাহাবীর ব্যাপারে পাপাচারিতার অপবাদ লাগানোর নামান্তর। এটি মুনাফেকীর অন্যতম একটি শাখা যা দ্বীন থেকে বিচ্যুতির সুস্পষ্ট লক্ষণ।

মাসআলা : যত ওলী, গাউস, কুতুব, ইমাম কিংবা মুজাহিদ কোন একজন ছোট সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না; আর আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা তো আরো বহু গুণ উপরে।

(অনেকে হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর ব্যাপারে অশ্রাব্য ও অশালীন মন্তব্য করে ফেলে এবং খেলাফতে রাশেদায় পরবর্তী সকল দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য তাকে দায়ী হিসেবে সাব্যস্ত করে। তাদের এ জাতীয় মন্তব্য ও আকিদা বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং একজন সাহাবীর ব্যাপারে বেয়াদবী। স্মরণ রাখতে হবে, হযরত মু'আবিয়া রাযি. একজন জলীলুন কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওহী লিখক সাহাবিদের অন্যতম। তাঁর ব্যাপারে বেয়াদবীমূলক কোন শব্দ উচ্চারণ করা কিংবা এ জাতীয় কোন আকীদা পোষণ করা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন! –অনুবাদক)

কোন ঠাকুর বা পাদ্রীকে ঝুঁকে সম্মান করা

প্রশ্ন : যারা পাদ্রীদেরকে ঘরে এনে তাদের পায়ের সামনে মাথা ঝুকিয়ে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে থাকে। অনেক মুসলমানও এমনিট করে। এর বিধান কী?

উত্তর : আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া অন্য কারো সামনে সিজদা করা (চাই সে পীর হোক, পয়গম্বর বা বাদশাহ যে কেউ হোক না কেন),

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্যতম হারাম এবং কবীরা গুনাহ। ইবাদতের নিয়তে হলে এর কারণে কুফর সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি সম্মান প্রদর্শন বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে না হয় তাহলেও অনেক ওলামায়ে কেরাম একে কুফরের কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেন।

কোন আলেম বা বাদশাহ এর সামনে জমিনে চুমু খাওয়া হারাম। যে চুমু খায় এবং যে তার জন্য এমনটি করা পছন্দ করে উভয়েই গুনাহগার হবে। কেননা এটা মূর্তি পূজারকদের কাজের ন্যায় ঘৃণ্য ও গর্হিত। সুতরাং যদি পাদ্রী প্রমুখদেরকে ইবাদত বা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এভাবে করে তবে কাফের হয়ে যাবে, আর যদি নিছক অভিবাদন বা স্যালুট করার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে কাফের না হলেও কবীরা গুনাহগার হবে।

–আদ্দুররুল মুখতার ও শামী : ৫/৩৩৭

প্রশ্নোক্ত অবস্থায় যেহেতু ইবাদতের উদ্দেশ্যে না করে অভিবাদন প্রদর্শনের লক্ষ্যেই পাদ্রীদের সামনে এভাবে সিজদার ন্যায় ঝুঁকে থাকে, তাই এ থেকে তওবা ইস্তেগফার করা এবং বিবাহ দোহরায়ে নেয়া আবশ্যক।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৩৭৮

মাসআলা : মুসলমানদের মাঝে এই আকীদা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তাই মানুষের কপাল ও মাথা ঝুকানোর মাধ্যমে সিজদা পাওয়ার যোগ্য। এ কারণেই ইসলামী শরীয়ত গায়রুল্ল-াহকে সিজদা করা হারাম সাব্যস্ত করেছে।

এমনিভাবে কারো সামনে রুকুর ন্যায় ঝুঁকে সালাম কিংবা সম্মান প্রদর্শন করাকেও ইসলাম মাকরূহ সাব্যস্ত করেছে। নিজের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শনকারীর কৃতজ্ঞতা আদায় করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দয়া ও করুণা প্রদর্শণকারী হিসেবে যে ভাষায় সম্ভব তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তবে এর সর্বোত্তম বাক্য হচ্ছে جزاك الله বলা। কিন্তু গায়রুল্লাহকে সিজদা করা যেমনিভাবে হারাম তদ্রূপ কারো সামনে রুকুর ন্যায় ঝুঁকে যাওয়াও না-জায়েয।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/২৯০, শামী : ৫/২৩৮,

মাসআলা ঃ সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মায়ের পা ছোঁয়া কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এভাবে সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামী তরীকা নয়। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৫/৩৫৩

াসআলা : মাথা ঝুঁকিয়ে কারো পায়ে চুমু খাওয়া কিংবা কবরে চুমু খাওয়া যাবে না। কারণ মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করাই বৈধ নয়, তাহলে মাথা ঝুঁকিয়ে সিজদার সাদৃশ হয়ে পায়ে চুমু খাওয়া সহীহ হবে কিভাবে? আর কবরে চুমু খাওয়ার মাধ্যমে জমিনে চুমু খাওয়া হয় বিধায় তা হারাম। তদ্রূপ সিজদার সাথে সামঞ্জস্য থাকার কারণেও তা হারাম। এমনিভাবে এর মাধ্যমে গায়রুল্লাহ এর তা'যীম ও সম্মান করা হয় বিধায়ও এটা হারাম। এ সবগুলো কাজই হারাম। –আযীযুল ফাতাওয়া : ৪/১৪

মাসআলা : যদি ইবাদত এবং সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ওলামা বা বড় বুযূর্গদের সামনে মাথা ঝুঁকায় এবং জমীনে চুমু খায় তাহলে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি সালাম বা অভিবাদনের উদ্দেশ্যে এমনটি করে তাহলে কাফের না হলেও কবীরা গুনাহগার হবে।–আযীযুল ফাতাওয়া : ১/১৬

কুফরী বাক্য উচ্চারণকারীর যবাইকৃত প্রাণীর বিধান

মাসআলা : কোন মুসলমানের যবান থেকে যদি এমন কোন বাক্য উচ্চারিত হয়, যা কুফরীর দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু ঐ বাক্যকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে কুফরীর বিধান থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়, তাহলে তার ব্যাপারে কুফরের ফাতওয়া দেয়া যাবে না। আর উক্ত ব্যক্তির যবাইকৃত পশু খাওয়াও নাজায়েয হবে না। তবে এ জাতীয় বক্তব্য দেয়া থেকে তাকে কঠোরভাবে প্রতিহত করতে হবে । —ফাতাওয়া মাহমুদিয়া : ১১/৩৫৩

বুযূর্গদের পায়ে চুমু খাওয়া

মাসআলা : বুযূর্গদের পায়ে চুমু না খাওয়ার মধ্যেই সতর্কতা। কারণ এভাবে চুমু খাওয়া, সম্মান প্রদর্শন করা, সিজদা করা, জমীনে এবং বুযূর্গদের হাতে চুমু খাওয়া সর্ব-সম্মতভাবে হারাম এবং কবীরা গুনাহ। বরং কোন কোন ফুকাহাতো এক্ষেত্রে কুফরের বিধান প্রয়োগ করেন ।

—আযীযুল ফাতাওয়া : ১/৭১৩-৭১৪

মাসআলা : পীর সাহেবকে সম্মানসূচক সিজদা করা হারাম ।

—ইমদাদুল আহকাম : ১/১১৪

মাসআলা : সম্মানসূচক সিজদাকে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম কুফর বলেন। এই লক্ষ্যে সিজদা করা কেবলমাত্র আল্লাহর সাথেই খাস। আর যারা নিজেদের পীর সাহেবদের ছবিকে সিজদা করে, তারা অভিশপ্ত এবং বিতাড়িত। এদের এ ধরনের কুফরী এবং শিরকী কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় ও সন্দেহ নেই। —আযীযুল ফাতাওয়া : ১/১৭

মাযার সংক্রান্ত বিধিবিধান

প্রশ্ন : ওলি ও বুযূর্গদের মাযারের জন্য নযরানা পেশ করা এবং মান্নত করা জায়েয কিনা? এমনিভাবে তাদের মাযারে ফুল ছিটানো এবং চাদর ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করা সহীহ কিনা?

উত্তর : আওলিয়ায়ে কেরামের মাযারের জন্য মান্নত করা এবং নযরানা পেশ করা হারাম। আর যদি আকীদা বিশ্বাস এমন হয় যে, মাযারওয়ালা বুযূর্গ আমাদের উদ্দেশ্য সমূহ পূরণ করতে সক্ষম এবং দুনিয়ার সব কিছু তাদের ক্ষমতাতেই হয় তাহলে এটা হবে সম্পূর্ণ শিরক ।

—ফাতাওয়া মাহমুদিয়া : ১/১২২, মারাকিল ফালাহ : ৩৩৮

মাসআলা : মাযারে চাদর আবৃত করা নিষিদ্ধ। আর ওলীগণের ব্যাপারে এই আকীদা পোষণ করা যে, আমরা যখনই মুসিবতগ্রস্ত হয়ে তাদেরকে ডাক দিয়ে তাদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি, তারা সকল স্থান থেকেই আমাদের ডাক শুনতে পান এবং আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। এটা ইসলামী আকীদা নয়, বরং মুশরিকদের আকিদা। এর দ্বারা ঈমান চলে যায়। –ফাতাওয়া মাহমুদিয়া : ১/২০৬, আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৬

মাসআলা : মাযারের দরজায় গিয়ে মাথা রাখা, সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদার ন্যায় অবস্থা ধারণ করা হারাম। আর ইবাদতের উদ্দেশ্যে হলে শিরক হবে। তদ্রূপ কবরে চুমু খাওয়া এবং মাযারের দরজা বা দেয়ালে চুমু খাওয়াও হারাম।

–মাহমূদিয়া : ১০/৬১, আল ফিকহুল আকবার : ২৩৮

মাসআলা : বানোয়াট কবর বানিয়ে কোন ওলীর মাযার বলে প্রচার করা সম্পূর্ণরূপে না জায়েয। কারণ এর দ্বারা মানুষদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়। এমনিভাবে মাযারে বাতি জ্বালানো, মাযারের জন্য মান্নত করা, মাযার সিজদা করাও সম্পূর্ণ হারাম। বাস্তবেও যদি কোন বুযুর্গের মাযার হয় তারপরও তো উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাজগুলো সেখানে করা নাজায়েয হবে। ইবাদতের নিয়তে কবরে সিজদা করা শিরক, সম্মান প্রদর্শনের নিয়তে করা হলে তা শিরকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে হারাম হবে। মান্নত যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয় আর ঐ মান্নতকৃত খানা মাযারের ফকীর মিসকীনদেরকে খাওয়ানো হয় তাহলে ঐ খানা ফকীরদের জন্য বৈধ হবে। পক্ষান্তরে, যদি মাযারের জন্য মান্নত করা হয় তাহলে উক্ত মান্নতের খাবার হারাম হবে, তা খাওয়া বৈধ নয়। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ৫/৩২২

মাসআলা : অনেকে কবরে হাদিয়া ও নযরানা পেশ করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে মাযারের ওলীর নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং ওলীকে নিজের প্রয়োজন পূরণকারী বলে বিশ্বাস করে, এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ শিরক। এ জাতীয় খবার খাওয়া বৈধ নয়।

মাসআলা : ওরস উপলক্ষে এবং অন্যান্য সময়ে ওলীদের মাযারে যে নযরানা পেশ করা হয় তা মাকরূহ এবং সম্পদের অপচয় । আর জন-সাধারণ এ ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস পোষণ করে তা তো সুস্পষ্ট শিরক। অরো

জঘন্য বিষয় হচ্ছে– কিছু লোক বহু দূর দুরান্ত হতে সফর করে নিজের বাচ্চাদের নিয়ে আসে এবং সেখানেই তাদের মান্নত পূরা করে। কেউ কেউ সেখানে চেরাগ এবং মোমবাতি জালিয়ে থাকে, অনেকে কবর পাকা বানায় অথচ কুরআনে কারীমে পরিস্কারভাবে এ বিষয়গুলো থেকে তওবা করার আদেশ এসেছে।

মাযারে গিয়ে আকীকা করা

প্রশ্ন : অনেক মহিলা এভাবে নিয়ত করে যে, যদি আমার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহলে অমুক মাযার বা পবিত্র স্থানে গিয়ে ছেলের চুল কামাবো এবং সেখানেই তার আকীকা করবো। এভাবে নিয়ত করা কেমন?

উত্তর : এটা একটা হিন্দুয়ানী কুপ্রথা যা মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। যেহেতু এর মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস রয়েছে তাই এটা বিশ্বাসগত বিদআত। কোন কোন অবস্থায় তা মিথ্যা ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। যেহেতু অমুক বুযূর্গ বাচ্চা দান করেছেন অনেকে এই আকিদা পোষণ করে তার মাযারে নযরানা পেশ করার মান্নত করে থাকে। আর সে মান্নত পূরণ করার জন্য বাচ্চাকে মাযারে নিয়ে মাথা মুন্ডন এবং আকীকা করা। এছাড়াও আরো অনেক কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের জন্য এ সব কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। –আপকে মাসায়েল : ৪/২৩৯

জীবন রক্ষার্থে কুফর এর স্বীকৃতি

কোন মুসলমান যখন কাফের ও মুশরিকদের কাছে পরাস্থ হয়ে যায় আর 'আমি মুসলমান নই' বলা ছাড়া জীবন রক্ষার অন্য কোন উপায় না থাকে, এভাবে অনন্যোপায় হয়ে গেলে জীবন রক্ষার্থে মৌখিকভাবে সাময়িক এ বাক্য উচ্চারণ করার কারণে গুনাহ হবে না। তবে নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছার পর ঐ মিথ্যা থেকে অবশ্যই তওবা করে নিতে হবে। অবশ্য এ জাতীয় অবস্থাতেও কুফরী বাক্য না বলাই উত্তম। যেমনিভাবে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. ঈমানের ওপর অটল অবিচল ছিলেন; কুফরী বাক্য মুখে উচ্চারণ করেন নি। হাদীসে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৪/৯১

কুফরী বাক্য বলার পর বিবাহের বিধান

মাসআলা : কুফরী বাক্য বলার দ্বারা বিবাহ ভেঙ্গে যায়। অর্থাৎ যেসব কথা ও কাজের দ্বারা ঈমান চলে যায়, সেগুলোর দ্বারা বিবাহও ভেঙ্গে যায়।
–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৪/৭৯

মাসআলা : কুফরী বাক্য বলার পর ঈমান নবায়ন করে সাথে সাথে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নতুন মহর ধার্য করে বিবাহও দোহরাতে হবে। বিবাহের খোতবা এবং ইলান করা ফরয নয়, বরং সুন্নত। উল্লেখ্য বিবাহ নবায়নের জন্য ইদ্দত পালন আবশ্যক নয়। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৮/১১০

ঈমান নবায়নের পদ্ধতি

মাসআলা : মুখে কালিমায়ে শাহাদাত বলার পাশাপাশি অন্তরে ঐ সব বিষয়ের বিশ্বাস স্থাপন করবে যেগুলো অবিশ্বাসের কারণে ঈমানহারা হয়েছে এবং সে গুলোর স্বীকৃতি প্রদান করবে। কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ছেড়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে তাহলে খৃষ্ট ধর্ম বর্জন করে তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনবে। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১২/১১৬

মাসআলা : মুরতাদ (ধর্মান্তরিত) হওয়া অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। তবে মুরতাদ হওয়ার পর কেউ যদি আন্তরিকভাবে ও আন্তরিকতার সাথে তওবা করে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হয় তাহলে মুসলমানগণ তাকে নিজেদের মধ্যে গণ্য করে নিবেন। –কেফায়াতুল মুফতী : ১/৪৬

হাদীস অস্বীকারকারী মুসলমান নয়

মাসআলা : নিজেদেরকে আহলে কুরআন দাবীদার গোষ্ঠী হাদীস অস্বীকার করে এবং হাদীস নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ ও উপহাস করে। নামায নিয়ে উপহাস করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে, এরা ইসলাম ধর্ম থেকে বহিস্কৃত। এদের জানাযা পড়া, মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা, এদের সাথে বিবাহ শাদী ইত্যাদি করা, এমনকি কোন ধরনের সম্পর্ক রাখাই ঠিক নয়। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১/২

শিক্ষককে অপমানিত করা কুফর নয়

মাসআলা : পিতা মাতা এবং শিক্ষককে কোন ধরনের শরঈ কারণ ব্যতীত অপমানিত করা গুণাহের কাজ; তবে এর কারণে কুফর সাব্যস্ত হয় না। এ কারণে ঈমান চলে যায় না, তদ্রূপ বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটেনা। উল্লে-

খ্য, কোন ব্যক্তি যদি কোন নির্ধারিত হারাম জিনিসকে হালাল বলে আকীদা রাখে তবে তা কুফর হবে, এর কারণে ঈমান চলে যাবে এবং বিবাহও ভেঙ্গে যাবে। –মাহমূদিয়া : ১০/৬১

মাসআলা : 'আল্লাহ তা'আলা একেবারেই বে-ইনসাফ কাউকে সন্তান সন্তুতি দেন আবার কাউকে দেন না' এটা কুফরী বাক্য (নাউযুবিল্লাহ)। এমন বাক্য বলে ফেললে অবশ্যই তওবা ইস্তেগফার করে ঈমান ও বিবাহ নবায়ন করতে হবে।

গুনাহের ওপর গর্ব করা

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে এবং এভাবে বলে যে গুনাহের ব্যাপারে আমার গর্ব হয়, তার বিধান কী?

উত্তর : শরীয়তের বিধি-বিধানের বিরোধিতা এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী নিঃসন্দেহে কুফরী কাজ। তাই এমন ব্যক্তি ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে মুরতাদ (ধর্মান্তরিত) হয়ে গেছে। তার জন্য ঈমান নবায়নের সাথে সাথে বিবাহ দোহরানো আবশ্যক। বর্তমান হাকেম (বিচারপতি) সাহেবের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাকে তওবা এবং ঈমান নবায়নের জন্য গুরুত্ব দেয়া। আল্লাহ না করুন সে যদি তওবা না করে তাহলে তাকে হত্যা করে দিতে হবে। যখন কৌতুক ও রসিকতার ছলে কুফরী বাক্য বলার অপরাধে এবং প্রকাশ্যে গুনাহ সম্পাদনকারীকে মুরতাদ এবং হত্যাযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেখানে গুনাহের উপর গর্ব অহংকারকারীর কুফরের ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না।

–আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৪০

অমুসলিম দ্বারা ঝাড়ফুক করানো

মাসআলা : অমুসলিম যদি চিকিৎসা শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করে (যেমন কোন অমুসলিম ডাক্তার বা হাকীম) তবে তাদের দ্বারা চিকিৎসা নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যেমনিভাবে কোন অমুসলিম ওকীল দ্বারা মামলা মকদ্দমা পরিচালনা করাতে কোনো অসুবিধা নেই। চিকিৎসার অন্য একটি পদ্ধতি হচ্ছে এক্ষেত্রে চিকিৎসককে আল্লাহ পাকের বিশেষ মকবূল বান্দাহ মনে করা হয় এবং তার যবান থেকে বের হওয়া দুআ বরকতী ও গ্রহণযোগ্য, তাই তিনি দম করলে তার বরকতে আল্লাহ তা'আলা অসুস্থতা

দূর করে দিবেন মনে করা হয় । এ পদ্ধতিতে কোন অমুসলিম দ্বারা ঝাড় ফুক করানোর অর্থ দাঁড়ায় অমুসলিম আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য এ কথার স্বীকৃতি দেয়া । অথচ সে তার কুফরীর কারণে এ বিষয়ের যোগ্য নয় । এমন ধারণার দ্বারা আকীদা নষ্ট হয়ে যায় । –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৪/৬৩

শিরকী মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মন্ত্র পড়ে চিকিৎসা করে । তার উক্ত মন্ত্রে গায়রুল্লাহ থেকে সাহায্য চাওয়া হয় । আল্লাহ তা'আলার আলোচনা বিন্দু পরিমাণও করে না । এভাবে ঝাড়ফুকের শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : এমন ব্যক্তির দ্বারা ঝাড়ফুক করানো জায়েয নয় । তাদের মন্ত্রে দেবতাদেরকে সুস্থতা দানকারী এবং ক্ষমতাবান মনে করা হয় । আর ঝাড় ফুককারী কবিরাজরা নিজেদেরকে ওইসব দেবতাদের খুব ঘনিষ্ঠ মনে করে । এটি ইসলামের শিক্ষা বিরোধী একটি কুফরী বিশ্বাস । আর এমন লোক দ্বারা ঝাড়ফুক করানোর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তার এ ভ্রান্ত আকীদার সমর্থন এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়ে থাকে । সুস্থতা দানকারী, প্রয়োজন পূরণকারী এবং সর্বময় ক্ষমতাধর হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা । এর বিরোধিতা করার দ্বারা দুনিয়াও ধ্বংস আর মৃত্যুর পর রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১০/১১৫

মাসআলা : কুফরী কালাম দ্বারা ঝাড়ফুক করা এবং করানো কখনোই বৈধ নয় । আর এসব কুফরী শব্দ ও বাক্যকে সঠিক মনে করাও কুফরী । এর দ্বারা স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং ঈমান চলে যায় । ঝাড়ফুককারী উক্ত কুফরী কালাম বিসমিল্লাহ পড়েই শুরু করুক, আর লোকজনও তার মাধ্যমে চিকিৎসা লাভ করুন না কেন, তাতে কোন পার্থক্য নেই । জেনে শুনে এভাবে কুফরী কালাম দ্বারা চিকিৎসাকারীদের অবশ্যই তওবা ইস্তেগফার পূর্বক ঈমান এবং বিবাহ দোহরানো আবশ্যক ।

–নেযামুল ফাতাওয়া : ১/৫১

দরূদে তাজ পড়া

প্রশ্ন : দরূদে তাজ পড়ার বিধান কী? উক্ত দরূদ এর মধ্যে دافع البلاء والوباء والقحط والالم মুসিবত, মহামারি, দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাথা দূরকারী হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্থির করা হয়েছে?

উত্তর : কুরআনে পাক, হাদীস শরীফ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং সালাফে সালেহীন প্রমূখদের যুগে দরূদে তাজ পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই দরূদটি পরবর্তী বহু বছর পর আবিস্কৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি. গণকে যেসব দরূদ যেমন: দরূদে ইবরাহীমি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন, পরবর্তীতে আবিস্কৃত অন্য কোন দরূদই সে গুলোর সাথে তুলনার অযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যবান থেকে নি:সৃত বরকতী শব্দসমূহ কোন বান্দাহ এর মুখ থেকে বের হওয়া শব্দের মাঝে আসমান জমীন পার্থক্য।

সারকথা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শিখানো এবং হাদীসে প্রমাণিত দরূদগুলো পাঠ করবে। আর যে সব দরূদ হাদীস শরীফে প্রমাণিত নয়, সেগুলোকে মাসনূন হিসেবে বিশ্বাস করা যাবে না। দরূদে তাজ এর মধ্যে উল্লেখিত বাক্য সমূহ পড়ার অনুমতি উলামায়ে কেরাম দেন নি। কারণ সমস্যাবলী সমাধানের একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। মাখলূকদের কাউকে বাস্তবেই মুসিবত দূরকারী মনে করা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা পরিপন্থী।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/২৯৮, ফাতাওয়া রশিদিয়া : ১৬২
তিরমীযি শরীফ : ২/১৭৫,

মাসআলা : মুর্খদের সমাজে দরূদে তাজের যে ফযীলত প্রসিদ্ধ রয়েছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন; হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কোন বিষয়ের ফযীলত এবং সাওয়াবের পরিমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণনা করা ছাড়া জানা অসম্ভব। এই দরূদটি খায়রুল কুরূনের অনেক পরে আবিস্কৃত হয়েছে, তাই এর ফযীলত ও সাওয়াব কে বা কারা নির্ধারণ করেছে তার কোন হদীস নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত দরূদগুলো বাদ দিয়ে মাসনূন নয় এমন সব শব্দ সম্বলিত দরূদ এর ব্যাপারে বড় বড় সওয়াবের আকীদা রেখে সেগুলোর ওযিফা পাঠ করাকে আবশ্যক করে নেয়া বিদআত। আবার এ দরূদে তাজে دافع البلاء মুসিবত প্রতিহতকারী ইত্যাদি শব্দের সম্পর্ক স্থাপনে আম জনতা অপরাগ। তাই এটা পড়ার অনুমতি সাধারণ জনগণকে শিরক এর মধ্যে লিপ্ত করার নামান্তর। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৩০১, মাজমাউল বিহার : ২/২২৪,
ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/২২২

মাসআলা : হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম এর সাথে سيدنا শব্দ বলা বিদআত নয়। এভাবে বলা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। —ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৩/৩০৯

দু'আর মধ্যে ওসীলা বানানো

প্রশ্ন : আম্বিয়ায়ে কেরামকে ওসীলা বানানো জায়েয কিনা?

উত্তর : জীবিত কিংবা মৃত ব্যক্তি, নিজের কিংবা অন্যের আমলের দ্বারা ওসীলার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর রহমতের ওসীলা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অমুক মকবূল বান্দাহ এর উপর যে রহমত করেছেন সেই রহমতের ওসীলায় দু'আ করছি, কিংবা অমুক নেক আমল সম্পাদন তো আল্লাহর রহমত ও তাওফিকে সম্ভব হয়েছে, সেই রহমতের ওসীলায় দু'আ করছি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার রহমতের ওসীলায় দু'আর বৈধতা এমনকি তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে অধিক আশা করা যায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পূর্বোক্ত সকল অবস্থাই এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে শামিল করে। অতএব ওসীলা বানানোর উপরোক্ত অবস্থাগুলো বৈধ। আর এসব ওসীলার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, হে আল্লাহ! আপনার যে রহমত বলে আমাকে অমুক অমুক নেক আমলের তাওফীক দিয়েছেন আমি ঐ রহমতের ওসীলায় দু'আ করছি। ওসীলা বানানোর বাস্তবতা ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এর ফযীলত প্রমাণ করার জন্য কোন দলীল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। —আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৩২, আপকে মাসায়েল : ১/৩২

মাসআলা : ওসীলা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা "ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুসতাকীম" কিতাবে উদ্ধৃত আছে। কোন বুযূর্গকে সম্বোধন করে কিছু চাওয়া শিরক। চাই বুযূর্গ জীবিত হোক কিংবা মৃত। তবে আল্ল-াহ তা'আলার দরবারে এভাবে ফরিয়াদ করা যে– হে আল্লাহ! আপনার নেক ও মাকবূল বান্দাহগণের ওসীলায় আমার এই এই উদ্দেশ্য সফল করুন এটা শিরক নয়। —আপকে মাসায়েল : ১/৩১, ফাতাওয়া আব্দুল হাই : ৩৪৯, ৩৯৫

ওসীলার প্রকারভেদ এবং বিধান

মাসআলা : মানুষ ওসীলা দুইভাবে করে থাকে : (১) এভাবে বলে, হে অমুক পীর সাহেব! আপনি আল্লাহর থেকে আমার এই উদ্দেশ্য পূরা করিয়ে দেন।

অথবা নিজের পীর বা বুযূর্গকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে। তাদের কাছে নিজের কাঙ্খিত বিষয়াবলী কামনা করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কার্যাবলীতে সহযোগী মনে করে। যেমন : বড়পীর সাহেব 'সাহায্য করুন' বলা, কোন মাযার ওয়ালাকে নিজের কাজটা করতে বলা ইত্যাদি। এ প্রকারের ওসীলা করা নাজায়েয এবং শিরক। এসব পদ্ধতিতে সাহায্য চাওয়া কারো কাছ থেকে সরাসরি চাওয়াকে বুঝায়। কিন্তু সাধারণ জনগন এটাকে ওসীলা মনে করে ব্যাপকভাবে এমনটি করে থাকে।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের ওসীলা হচ্ছে-এভাবে ওসীলা বানানো যে, আয় আল্লাহ! আমি অমুক ব্যক্তির বরকত এবং ওসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, তার ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করে নিন। এই ধরনের ওসীলা করা বৈধ। এর বৈধতার ব্যাপারে বহু দলীল বিদ্যমান। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ববর্তী নবীগণের ওসীলা নিয়ে দু'আ করেছেন। –নেযামুল ফাতাওয়া : ১/৭০, জমউল ফাওয়ায়েদ : ২৬৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওসীলায় দু'আ করা

আল্লাহ তা'আলার নিকট ওসীলা ছাড়া দু'আ করাও সহীহ আছে। আবার কোন বুযূর্গ বা নেক আমলের ওসীলায় দু'আ করা সেটাও সহীহ আছে। যেমন : হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল-ামের ওসীলায় আমার অমুক প্রয়োজন পূরা করুন। এটা জায়েয, একে শিরক বলা ভুল। এভাবে দু'আ করার শিক্ষা স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে দিয়েছেন। ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৭/৪৯৯
–তিরমীযি শরীফ : ১/৯৯, মিশকাত শরীফ : ১৯৬,

গণককে হাত দেখানো

প্রশ্ন : ভবিষ্যৎ জানার জন্য এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কাউকে হাত দেখানো জায়েয আছে কিনা? যদি শখ করে হাত দেখায় কিন্তু তার কথার উপর বিশ্বাস না করে তাহলে কী হুকুম হবে?

উত্তর : এভাবে হাত দেখানো জায়েয নেই। আগ থেকেই যার এই ভ্রান্ত আকিদা থাকে তাকে অবশ্যই আকীদা বিশুদ্ধ করত: তওবা করতে হবে। আর যার আকীদা শুরু থেকে খারাপ নয়; বরং অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এভাবে হাত দেখায়, তার জন্যও এ উদ্দেশ্যে হাত দেখানো

অনুমতি নেই। কারণ এর ফলে তার আকীদা খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকেই যায়। খারাপ আকীদাওয়ালা লোকদের জন্য এটা আরো মারাত্মক ক্ষতিকর। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৮/৭৭

তারকারাজির গতিবিধির আলোকে ভবিষ্যৎ বলে এমন গণকের কথায় বিশ্বাস করা কুফরী। গণককে হাত দেখানোর প্রবণতা একেবারেই ভ্রান্ত। যা একেবারেই অহেতুক কাজ এবং এর গুনাহও অনেক জঘন্য। হাত দেখাতে অভ্যস্ত লোক সর্বদা অস্বস্তিতে সময় কাটায় এবং লোকজনের যেই সেই কথায় ঘাবড়িয়ে যায়।

মাসআলা : ইসলামে হস্তরেখা দেখে ভবিষ্যৎ বলা এবং এসব বিষয়ের উপর বিশ্বাস করা জায়েয নয়।

মাসআলা : হাত দেখে যারা ভাগ্য বলে তাদের কাছে যাওয়া গুনাহ। আর এ জাতীয় কথায় বিশ্বাস করা কুফরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে কিছু জানতে চাইল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না।"

–সহীহ মুসলিম : ৫৯৫৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন, এরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের ওপর নাযিল হওয়া দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। তন্মধ্যে একজন হলো ওই ব্যক্তি যে জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে।

–বুখারী শরীফ : ৩/৯৭, মুসলিম : ২/২৩৩,
তিরমিযী শরীফ : ১/৩৯৯, আপকে মাসায়েল : ১/৩৭৩

মাসআলা : নিজের ভাগ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, সংবাদপত্র গুলোতে যে রাশিফল দেয়া থাকে, অমুক রাশির লোকের এই এই ঘটবে, এগুলো পড়া, জিজ্ঞাসা করা এবং এগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা গুনাহ। কেননা ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, অদৃশ্যের অবস্থা কিংবা ভাগ্যলিপি সম্পর্কে মানুষের কোনো জ্ঞান নেই, তদ্রূপ রাশির এবং তারকার কোন সত্তাগত ক্ষমতা নেই। সুতরাং এসবের প্রতি বিশ্বাস রাখা গুনাহ। এসব লোক সর্বদা পেরেশান থাকে, ফলে তারা সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়ে।

মাসআলা : তারকারাজির গতিবিধি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিশ্চিত নয়। এছাড়া তারকারাজির কোন নিজস্ব ক্ষমতাও নেই। অতএব এর উপর বিশ্বাস করা নিষেধ। —আপকে মাসায়েল : ১/৩৭৩

সময়কে গালি দেয়া

জাহেলী যুগে মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস ছিল যখনই তাদের কোন কষ্ট বা ক্ষতি হতো বা কোন বিপদে আপতিত হত, তারা সময়কে গালি দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ ঘৃণিত কাজ থেকে মানুষদের নিষেধ করেছেন। কেননা সময়ের নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা সত্তা নেই, বরং তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ তা'আলার কুদরতী কব্জার মধ্যে। সুতরাং ভাল, মন্দ, বিপদ-মুসীবত এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সম্পর্ক যা সময়ের সাথে করা হয় সবকিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তিনিই হলেন প্রকৃত কর্তা। অতএব সময়কে মন্দ বলা আল্লাহ তা'আলাকেই মন্দ বলার নামান্তর (যা কুফরী কালাম এবং অবশ্য বর্জনীয়)। لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر (তোমরা সময়কে গালি দিওনা, কেননা সময়ের নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। —সহীহ মুসলিম : ৬০০৩

পেচাঁকে কুলক্ষণে মনে করা

অনেকে পেঁচাকে কুলক্ষণে মনে করে এবং এই ধরণা পোষণ করে, যেখানে পেঁচা ডাকে ঐ স্থান উজাড় ও বিরান হয়ে যায়। এই ধারণাটি একেবারেই ভুল ও ভিত্তিহীন।

পেঁচা কুলক্ষণে নয়, এর ডাক দেয়ার কারণে কোন এলাকা বিরানও হয় না। স্মরণ রাখ! পেঁচা যে ডাক দেয় তার দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার যিকির করে। আর আল্লাহ তা'আলার যিকির করা কি কুলক্ষণে?

لا حول ولا قوة إلا بالله

তবে একথা সত:সিদ্ধ যে, পেঁচা খুব নির্জন জায়গায় বসতে পছন্দ করে তাই সে খোঁজ করে বিরান স্থানে গিয়ে বসে।

এখন দেখার বিষয় হলো উজাড় হওয়া জায়গা সে কীভাবে উজাড় করল? ঐ জায়গাটিতো আগেই উজাড় ছিল। সুতরাং 'পেঁচা যে স্থানে বসে ডাকে ঐ স্থান উজাড় হয়ে যায়' কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। কোন স্থান

উজাড় বা বিরান হওয়া এগুলো আমাদের গুনাহের কারণেই হয়ে থাকে, পেঁচার কারণে নয়।

প্রাণীকে কুলক্ষণে মনে করা

মাসআলা : অনেকে ঘোড়া ইত্যাদিকে কুলক্ষণে মনে করে। এরও কোন ভিত্তি নেই। বরং এগুলো মানুষের ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের অভ্যাস হলো নিজের দোষের পরিবর্তে অন্যের দোষ বেশি চোখে পড়ে। মূলত বিপদ আসে নিজের গুনাহের কারণে। আর নিষ্পাপ জানোয়ারের দিকে তার সম্পর্ক করে বলে বেড়ায় যে, অমুক ঘোড়া কুলক্ষণে, অমুক ষাঁড় কুলক্ষণে, অমুক প্রাণী অমুক সময়ে ডাক দেয়ায় এই কাজটি হয়নি, অমুক পশু ডাক দেয়ায় মহামারী বা রোগব্যাধি এসেছে। এসবগুলো খারাপ ধারণা ও ভ্রান্ত আকীদা এবং কুলক্ষণ নেয়া। শরীয়তে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

আঙ্গুল ফুটানোকে কুলক্ষণে মনে করা

ইসলামে কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। নামাযের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো মাকরূহ, তদ্রূপ নামাযের বাইরে আঙ্গুল ফুটানোও পছন্দনীয় নয়। বরং তা অহেতুক কাজ। —আপকে মাসায়েল : ৮/১৩৪

কোন কুলক্ষণের সাক্ষাৎ হয়েছে বলা

কারো কোন কারবারে ক্ষতি হলে, কিংবা কোন উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হলে অহরহ বলতে শোনা যায়, "না জানি আজ ভোরে কোন কপালপোড়ার সাথে সাক্ষাত হয়েছে"। একটু চিন্তা করা দরকার কোন ব্যক্তি প্রত্যুষে ঘুম থেকে শয্যাত্যাগ করার পর যদি তার পরিবারের কোন সদস্যকেই দেখে তবে কি তার ঘরের সদস্যও এরূপ কুলক্ষণে ও পোড়াকপালে হবে যে, তাকে দেখার কারণে সারা দিন তার সাথে অমঙ্গল লেগেই থাকবে। ইসলামে এ ধরনের অমঙ্গল ও কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। এটা সম্পূর্ণ ধারণা প্রসূত কথা। —আপকে মাসায়েল : ১/৩৭৫

কোন স্থানকে অমঙ্গল মনে করা

কোন স্থানের ব্যাপারে অমঙ্গল হওয়ার ধারণা পোষণ করা জায়েয নয়। তবে কোন স্থানের ব্যাপারে এমনটি বলা যে, এ এলাকার আবহাওয়া ভাল নয়, তাই অন্যত্র যেখানে রোগ ব্যাধি কম হবে এবং সন্তান সন্ততি বেশি জন্মাবে সেখানে স্থানান্তর হয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়।

—মাযাহিরে হক জাদীদ : ৫/৩০১, ইমদাদুল আহকাম : ১/১৩৯

বদ নযর এর বাস্তবতা

সহীহ বুখারী শরীফের কিতাবুততিব এর বদ নযর অধ্যায়ের হাদীসে এসেছে العين حق অর্থাৎ বদনযর লেগে যায় এটা সত্য। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুলবারী : ১০/২০৪ এ উক্ত হাদীসের অধীনে আলোচনা করতে গিয়ে মুসনাদে বাযযার থেকে হযরত জাবের রাযি.-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তাকদীর নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ হওয়ার পর অনেক লোক বদ নযরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।'

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বদনজরের কারণে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে এই রোগ তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে দেয়। বদ নযরের অন্যান্য ক্ষতি এ থেকেই অনুমান করা যায়। হাদীস শরীফে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, কারো নিকট কোন বস্তু খুব সুন্দর ও ভালো মনে হলে সে যেন অবশ্যই ماشاء الله لا قوة الا بالله বলে। এ বাক্য বলার পর বদনজর লাগে না। —আপকে মাসায়েল : ১/৩৭৮

মাসআলা : সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর বদ নযর থেকে বাঁচানোর জন্য মায়েরা সন্তানদের গলায় বা হাতে কালো তাগা ইত্যাদি ঝুলিয়ে দেয়। আবার অনেকে কপালে বা গলার নিচে কাজল ইত্যাদির কালো টিপ দিয়ে দেয় এগুলো ভিত্তিহীন কাজ। শরীয়তে এগুলোর কোন স্থান নেই।

—আপকে মাসায়েল : ১/২৭২

মাসআলা : তবে কালো টিপ লাগানোর দ্বারা আকীদা খারাপ না হলে তা লাগানো বৈধ হবে। তখন উদ্দেশ্য হবে, এসব কালো টিপ দাগা ইত্যাদি লাগিয়ে বাচ্চাকে অসুন্দর করে দেয়া যাতে বদনযর লাগতে না পারে। —আপকে মাসায়েল : ৮/১২৫

মাসআলা : বদ নযর লাগা সত্য। তাই এটা দূর করার জন্য তদবীর করা যাবে। তবে শর্ত হলো শরঈ পদ্ধতিতে তা হতে হবে।

—অপাকে মাসায়েল : ৮/৪৫৩

বদ নজর দূর করার জন্য মরিচ জালানো

বদ নজর দূর করার জন্য মরিচ পড়ে আগুনে জালানো যাবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো শরীয়ত বিরোধী কোন কিছু পড়া যাবে না। যেমন : কোন

দেবদেবীর দোহাই দেয়া বা কোন জ্বীন ও শয়তান থেকে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি করা যাবে না। —ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৫/৩৫০

বদ নযর ও আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত উম্মে সালামা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে একটি মেয়ে দেখতে পেলেন যার চেহারায় হলদে ভাব দেখাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "একে দম কর, এর উপর বদ নজর লেগেছে।" —বুখারী শরীফ, মুসলিম

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের ক্ষতি এবং মানুষের বদ নজর থেকে আল্ল-াহর কাছে পানাহ চাইতেন, এক পর্যায়ে সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হয়। এরপর এ দুটির ওপর আমল শুরু করেন এবং বাকীগুলো বাদ দেন। —তিরমীযি : ২১৩৫, ইবেন মাজাহ : ৩৫১১

বদ নজর এবং তার প্রতিক্রিয়া কোন বস্তুর ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। আর আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু চোখে এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, যখনই কোন জিনিসের প্রতি ভালভাবে নযর করে ঐ জিনিসের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "কোন বস্তু যদি তাকদীর ডিঙ্গিয়ে যেত তবে তা হতো বদ নজর।" অনেক লোককে এমন দেখা গেছে যাদের এক দৃষ্টিতে মানুষ, পশু পাখি এমনকি বড় বস্তু পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যেত। বদনযরের তদবীর হিসেবে কুরআন তেলাওয়াত বিশেষ উপকারী।

আধুনিক বিজ্ঞান বদ নজর স্বীকার করে কি না? এবং এ বিষয়ে কিছু আবিস্কার করেছে কিনা?

প্যারাসাইকোলজিস্ট এর গবেষণা

অদৃশ্য ইলম বা জ্ঞানকে প্যারাসাইকোলোজী বলা হয়। অর্থাৎ চোখে দেখা যায় না এমন গুপ্ত জ্ঞান অনুসন্ধানের নাম প্যারাসাইকোলোজী। এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মতে প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য কিরণ বিচ্ছুরিত হয়, যার মধ্যে আবেগময় শক্তির বিদ্যুৎ (Emotronal Energy)

থাকে। এ সকল বিদ্যুৎ দ্রুত লোমকূপের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় শরীরের স্বাভাবিক গঠনের অবনতি ঘটে।

যদি আবেগময় শক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহ বা আলোকরশ্মি পজেটিভ (+) হয়, তা হলে মানুষের উপকার হয় আর যদি এ রশ্মি নেগেটিভ (-) হয়, তবে অব্যাহত ক্ষতি হতে থাকে। কুদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের চক্ষু থেকে নির্গত রশ্মি মূলত নেগেটিভ হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে এত শক্তি নিহিত থাকে যে, শরীরের স্বাভাবিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে ওলট-পালট করে দেয়।

কোনো এক কুদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি কোনো সুন্দর একটি মাকড়শা দেখে এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় অন্য এক ব্যক্তির চেহারা কালো হয়ে গিয়েছে। তার রক্তে মিলানিন বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রুত রং কালো হয়ে যায়। মোটকথা, (বদ-নযর সম্পর্কিত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ল-ামের বাণী সঠিক। আর বদনজরের প্রতিরোধ হয় পবিত্র কুরআন এর মাধ্যমে। কুরআনের ওই নেগেটিভ বা নেতিবাচক রশ্মিকে দূর করে দেয়।
—সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান : ২৬৭

মহামারি আক্রান্ত এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া

মহামারি আক্রান্ত এলাকায় থাকলে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে এই আকীদা ও বিশ্বাসে উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া নাজায়েয এবং মারাত্মক গুনাহের কাজ। মৃত্যু আল্লাহর হুকুমে নির্দিষ্ট সময়েই আসবে। আল্লাহর হুকুম ছাড়া এক মুহূর্ত আগেও মৃত্যু আসবে না। —সূরা আ'রাফ : ৩৪, তাফসীরে মাযহারী : ১/৩৪৩

জাহেলী যুগে মানুষ মনে করতো যে, কেউ কোন অসুস্থ লোকের কাছে বসলে কিংবা তার সাথে খানা খেলে সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে অসুস্থতার জীবানু অনুপ্রবেশ করে। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা খন্ডন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন- لا عدوى অর্থাৎ, ইসলামে ছোয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই। তাকদীরের লিখনী ডিঙ্গিয়ে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম ব্যতীত কোন রোগ অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে না।

একদা এক কুষ্ঠ রোগীকে হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে একই প্লেটে খানা খাওয়ালেন। এর দ্বারা উম্মতকে এই শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত এবং তাকদীরের বাইরে কিছুই হয় না।

তবে মানুষের ঈমানের দুর্বলতার কারণে আকীদা সুসংহত রাখার জন্য মহামারি আক্রান্ত এলাকায় না যেতে এবং কোন মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে পালিয়ে না যাওয়ার প্রতি ইসলামী শরীয়ত নির্দেশনা প্রদান করেছে। কেননা ঐ এলাকায় যাওয়ার পর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে দুর্বল ঈমানদাররা বলে বসবে যে, এখানে যাওয়ার কারণে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছি। আবার পূর্ব থেকেই কোন মহামারী আক্রান্ত এলাকায় অবস্থান করে থাকলে সেখান থেকে পালিয়ে আসার পর এই আকীদা সৃষ্টি হবে যে, এখান থেকে চলে আসার কারণে বাঁচতে পেরেছি, নয়তো অবশ্যই মহামারীতে আক্রান্ত হতাম। তদ্রূপ মহামারী আক্রান্ত এলাকা হতে পালানো ব্যক্তি অন্যদের জন্যও পেরেশানী ও ভয়ের কারণ হয়। এ জাতীয় আরো বহু হেকমত ও কল্যাণের দিক লক্ষ্য করে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে এই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে, মহামারীতে যদি কোন এলাকা আক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে সেখানে যেওনা, আবার তোমাদের অবস্থানের জায়গাতে মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকেও পালিয়ে যেওনা। —বুখারী শরীফ : ২/৮৫৩, মুসলিম শরীফ : ২/২৯

এ জাতীয় এলাকা থেকে দূরে থাকার শরঈ নির্দেশনা শুধুমাত্র আকীদা বিশ্বাসের হেফাযত এবং ঈমান নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে নয় যে, দূরে থাকার কারণে রোগ থেকে সে বেঁচে যাবে। আবার এই নির্দেশনা প্রত্যেকের জন্য বা সর্বাবস্থায় আবশ্যক নয়। হাদীস শরীফের ভাষ্য হচ্ছে فرارا منه (মহামারী থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে বের হয়ো না।) এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে যে, মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে পালানোর উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে ঐ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়াতে কোন বাধা নিষেধ নেই। তবে শর্ত হলো আকীদা সহীহ থাকতে হবে। কোন ধরনের হেরফের থাকতে পারবে না।

তাকদীরের বাইরে কিছুই হয় না, বরং আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই সব কিছু হয় বলে যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে তার জন্য মহামারী আক্রান্ত এলাকা ত্যাগ করা বৈধ। পক্ষান্তরে যার আকীদা এরূপ মজবুত নয়, ঈমান আকীদা হেফাযতের লক্ষ্যে তার জন্য ঐ স্থানে যাওয়া এবং সেখান থেকে চলে আসার অনুমতি নেই। —আদদুররুল মুখতার, শামী সংযুক্ত : ৫/৬৬১

মহামারী আক্রান্ত এলাকার লোকজন আবহাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে শহরতলীর মরুভূমি, মাঠ ও জঙ্গলে যেতে পারবে। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তনকে চিকিৎসা হিসেবেই মনে করতে হবে। সর্বোপরি মহামারি উপদ্রুত এলাকা হতে ইচ্ছাকৃত ভাবে পালানো যাবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে ধৈর্য ও হিম্মতের সাথে সেখানেই অবস্থান করবে। ভাগ্যে লিপিবদ্ধ থাকলেতো অবশ্যই মহামারি আক্রান্ত হবে এবং এর মাধ্যমে শাহাদাতের মর্যাদা অর্জিত হবে। পালিয়ে যখন মৃত্যু রোধ করা সম্ভব নয়; তাহলে পালানোর দ্বারা ঈমান ধ্বংস করার কোন অর্থ হতে পারে না। ডাক্তার ও হাকিমগণ কোন কোন রোগকে ছোঁয়াচে বলে থাকেন এবং তাদের নিকট এ গুলোর জীবানু আছে বলে প্রমাণিত। আমরা এ মতের খন্ডন করা জরুরী মনে করি না। তবে এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে, রোগ নিজে নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে না; বরং আল্লাহর হুকুমেই ভাগ্য লিখনী অনুযায়ী মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে। যার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম থাকে না তার ক্ষেত্রে অনু পরিমাণ ক্ষতি করার ক্ষমতা কোন রোগের নেই। —ফাতহুলবারী : ১৫৯, শরহে নববী : ২/২২৮
ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৩৭১

কুষ্ঠ রোগীর সাথে সম্পর্ক রাখার বিধান

মাসআলা : দু'টি বিষয় ভালভাবে বুঝে নেয়া জরুরী।

১. এক শ্রেণীর মানুষের মানসিক অবস্থা শক্তিশালী হয়ে থাকে যারা এ জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের দেখতে পারে এবং এতে তাদের অন্তরে কোন ধরনের ক্ষতি বা হতাশার ছাপ পড়ে না। আবার অনেকের মানসিক অবস্থা দুর্বল থাকে, যারা এজাতীয় রোগীদের দেখে এবং তাদের সাথে উঠা বসা করে স্বাভাবিক থাকতে পারে না; বরং ঘাবড়িয়ে যায়।

২. শরীয়তের বিধি-বিধান সুস্থ-অসুস্থ এবং সবল ও দুর্বল সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। বরং দুর্বলদের দিকটা বিশেষ বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন; ইমাম সাহেবকে দুর্বলদের দিকে খেয়াল রেখে নামায পড়ানোর প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এ দু'টি বিষয় জানার পর এখন ভালভাবে বুঝে নিন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুষ্ঠ রোগীর সাথে একই প্লেটে বসে

নিজেই খানা খেয়েছেন। হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে তাঁর তরকারীর প্লেটে রেখে বললেন, "আল্লাহর নামে খাও, আল্লাহর ওপর ভরসা করে খাও।"

–তিরমীযি শরীফ : ২/৪

ইমাম তিরমীযি রহ হযরত ওমর রাযি সংশ্লিষ্ট এ জাতীয় একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাস্তব আমল দ্বারা একথাই যেন শিক্ষা দিয়েছেন যে, কুষ্ঠ রোগী কোন ঘৃণার পাত্র নয়। আর তা কোনো কুলক্ষণ ও অমঙ্গলও নয়। কিন্তু দুর্বলদের মনোবল ও হিম্মতের দুর্বলতার কারণে এটাকে সহ্য করতে পারে না বিধায় তাই তাদের স্বভাবগত দুর্বলতার দিক বিবেচনায় রেখে এগুলো থেকে দূরে থাকতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। –আপকে মাসায়েল : ৮/১২২

নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১১২, মাযাহেরে হক জাদীদ : ৫/২৯৬

মানব জীবনে পাথরের প্রভাব

প্রশ্ন : আমরা বিভিন্ন পাথরের যেসব আংটি পরিধান করে থাকি। এসব আংটিতে যার যার নামের তারকা খচিত পাথর ব্যবহার করা হয় যেমন : আকীক, ফীরোজ ইত্যাদি। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো ব্যবহার করা বৈধ কিনা?

উত্তর : মানব জীবনে পাথর কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে না; বরং মানুষের আমল অনুযায়ী তার জীবন প্রভাবিত হয়।

মাসআলা : পাথরের দ্বারা মানুষ বরকতপূর্ণ হয় না; বরং মানুষের আমলই তাকে বরকতপূর্ণ অথবা অভিশপ্ত করে। পাথরকে বরকতময় মনে করা আকীদার ভ্রান্ততা এ থেকে তওবা করা আবশ্যক।

–আপকে মাসায়েল : ১/৩৭৬

আংটির পাথর ও আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি ছিল রূপার তৈরী আর এর পাথর ছিল হাবশার তৈরী।

–তিরমীযি : ১৭৯৪, শামায়েল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপার আংটি পরিধান করেছেন যার পাথরের অংশও ছিল রূপা। আবার আকীক পাথর বিশিষ্ট আংটিও ছিল তাঁর। কখনো ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন কখনো করতেন বাম হাতে। তবে অধিকাংশ সময় ডান হাতেই আংটি পরতেন। আর পাথর রাখতেন তালুর দিকে। –তানবীরুল আযহার, রাহবারে যিন্দেগী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার করেছেন হাদীস শরীফ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তিনি এ উদ্দেশে তা ব্যবহার কেরননি যে, এর দ্বারা সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। হাদীস বিশারদদের মতে, সৌন্দর্যের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ব্যবহার করতেন।

–সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান : ৩৬৭

আংটি পরিধান করা

আংটিকে ভাগ্য পরিবর্তন বা অসুস্থতা দূর করার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করে তা পরিধান করা হারাম। এমনকি তা এক ধরনের শিরক। আর যদি এ ধরনের আকীদা না থাকে, তাহলে ব্যবহারের অনুমতি আছে। তবে একটি মাত্র আংটি ব্যবহার করতে পারবে যা রূপার তৈরি হবে এবং তাতে একটি মাত্র পাথর থাকবে। (পুরুষ আংটির পাথর তালুর দিকে রাখবে, আর মহিলা রাখবে উপরের দিকে)।

(পুরুষের জন্য সর্বোচ্চ সাড়ে চার মাশা বা ৪.৩৭৪ গ্রাম রূপা আংটিতে ব্যবহারের অনুমতি আছে। এর অধিক পরিমাণ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। আর মহিলার স্বর্ণ ও রূপার আংটিসহ যে কোনো অলংকার ব্যবহার করতে পারবে। রূপা ব্যতীত অন্য কোনো ধাতব বস্তু যেমন : লোহা, তামা, পীতল ইত্যাদির আংটি, চুড়ি বা অন্য কোনো অলঙ্কার ব্যবহার করা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই মাকরূহে তাহরীমী।–ফাতওয়ায়ে শামী : ৯/৫১৬-৫১৮, ফাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ২৮/৪৩)

মাসআলা : কোন কোন পীর আংটি বা আঙ্গুলে তামা এবং পীতলের তার বেধে থাকে, এটাও এক প্রকার শিরক, (তবে কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক যদি ধমনীর রোগ নিয়ন্ত্রণ কল্পে চিকিৎসা হিসেবে দেয় তাহলে তার হুকুম ভিন্ন)।

–মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমী

মাসআলা : কেউ কেউ সুস্থতার আশায় লোহা বা তামার আংটি পরিধান করে, এটাও বৈধ নয়। আর এই আংটি দ্বারাই আমার কাজ হয়ে যাবে এই বিশ্বাসে আংটি পরা কুফরী। অসুস্থদের চিকিৎসা করা বৈধ; কিন্তু লোহা, পীতল ও তামা পরিধান করা নিষেধ।

মাসআলা : অনেক নারী পুরুষ হাতে, পায়ে লোহা বা পীতলের কড়া পরিধান করে। তারা বলে, এটা 'গরীবে নেওয়ায' এর দরগাহ হতে এসেছে, খুবই বরকতপূর্ণ। এটা সম্পূর্ণ মূর্খতা।

মাসআলা : বাদশাহ, বিচারক এবং ওয়াকফ এর মুতাওয়ালী ব্যতীত অন্যদের জন্য আংটি পরিধান না করাই উত্তম।

মাসআলা : অনেক পুরুষ অলী আউলিয়াদের নামে নিজেদের নাকে এবং কানে স্বর্ণ, রূপা ইত্যাদির তৈরী বিভিন্ন ধুল ও কানফুল ব্যবহার করে এটাও শিরকী কাজ এবং হারাম। স্মরণ রাখবে! আম্বিয়ায়ে কেরাম আউলিয়াগণই যেখানে কারো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন না; সেখানে পাথরের টুকরা, লোহা, তামা এবং পীতলের কী ক্ষমতা থাকতে পারে? মনে রাখবে! আল্লাহর অলী কুফর ও শিরকের সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। আর এই শিরক বিরোধী দীক্ষা গোটা মাখলুককে দিয়ে গেছেন। তাহলে এ জাতীয় শরীয়তবিরোধী এবং কুফরী সংস্কৃতি তাঁরা সমর্থন করবেন কীভাবে? কখনোই নয়। এধরনের কাজ নিছক মূর্খতার কারণেই করে থাকে। অথচ এ চিন্তাটুকু করে না যে, কিয়ামতের দিন এর ফলাফল কী হবে?

–সহীহ মুসলিম : ২/১১৬, মিশকাত : ২/৬৬৬,
ফাতাওয়া আলমগীরী : ৪/২৯৫, আইনুল হেদায়া : ৪/২৩৩

তাকদীর পরিবর্তন সম্ভব নয়

দুনিয়ার সকল বিষয় সংঘটিত হওয়া না হওয়া আল্লাহ পাকের ইলম এর মধ্যে নকশা আকারে সংরক্ষিত। একেই তাকদীর বলে। এই নকশায় কোন পরিবর্তন হয় না।

আকীদার ভ্রষ্টতাসমূহ

মাসআলা : নওমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের পরপর ডায়রিয়া সৃষ্টি করার ঔষধ খাওয়াতে হয় অন্যথায় পবিত্র হয় না মর্মে যে কথা লোক মুখে প্রচলিত তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মাসআলা : কাউকে গালি দেয়ার কারণে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঈমান শূন্য থাকে। এই সময়ের মধ্যে মৃত্যু হলে বেঈমান অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে বলে ধরা হয়, এটাও ভুল কথা। তবে হ্যাঁ গালি দেয়ার কারণে অবশ্যই গুনাহগার হবে।

মাসআলা : শোয়ার সময় দক্ষিণ মেরুর দিকে পা দিয়ে শোয়া যাবে না, এটাও ভুল ধারণা।

মাসআলা : শস্য বুনার জন্য ঘর থেকে যেদিন বীজ বের করে ঐ দিনই বীজ বুনা থেকে অনেক মুর্খলোক বিরত থাকে। এ আকীদা একেবারেই গুনাহ। অবশ্যই তা বর্জন করতে হবে।

মাসআলা : অনেকে মনে করে দিনের বেলায় কাহিনী বললে মুসাফির রাস্তা ভুলে যায়। এ সব কথা ভিত্তিহীন ও মনগড়া। এ ধরনের বিশ্বাস রাখা বড় গুনাহ।

মাসআলা : অনেক মহিলা বসন্ত রোগকে কোন দুষ্ট ভূতের খারাপ আছর মনে করে থাকে এটাও ভিত্তিহীন ধারণা।

মাসআলা : অনেক মহিলা বসন্ত রোগের চিকিৎসা করানোকে খারাপ মনে করে। আবার অনেকে এটাকে দুষ্ট শয়তানের বদ আছর থেকে সৃষ্ট বলে মনে করে। এটাও ভুল ধারণা।

মাসআলা : বসন্ত রোগাক্রান্ত অবস্থায় ঘরে তরকারী পাক করাকে খারাপ এবং রোগ বৃদ্ধির কারণ মনে করাও ভিত্তিহীন ধারনা। হ্যাঁ কোন বিজ্ঞ ডাক্তার বা চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে সতর্কতা অবলম্বন করা হলে তাতে অসুবিধা নেই। —আগলাতুল আওয়াম : ২৭

মাসআলা : যে মহিলার বাচ্চা মরে যায় এমন মহিলার নিকট যেতে এবং বসতে অনেক মহিলাকে বাধা দিতে দেখা যায় এবং এও বলতে শুনা যায় যে, বাচ্চা মরে যাওয়ার পর রোগ অন্যের দিকে সংক্রমিত হতে পারে। এটা খুবই খারাপ কথা। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই এবং এটি মারাত্মক গুনাহ। —আগলাতুল আওয়াম : ২৬

জীবনের বদলায় বকরী যবাই করা

প্রশ্ন : জানের পরিবর্তে জান যথেষ্ট হয়ে যাবে এ লক্ষ্যে কোন পশু যবাই করা। অর্থাৎ মানুষের জীবনের বিনিময়ে পশুর জীবন উৎসর্গ করা

এবং আল্লাহ তা'আলা পশুর জীবন কবুল করে মানুষের জীবন বাকী রাখবেন। এভাবে পশু যবাই করা সহীহ কিনা?

উত্তর : এক্ষেত্রে জীবিত পশু সদকা করে দেয়াই উত্তম। রোগ থেকে সুস্থতা লাভের উদ্দেশ্যে যদি একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য পশু যবাই করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। তবে যবাইয়ের মূল উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করা, জীবনের পরিবর্তে জীবন নয়।

কোন পশুকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উৎসর্গ করাই বৈধ। তখন এ খেয়াল করতে হবে যে, যেমনিভাবে আর্থিক সদকা আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির কারণ হয়, তদ্রূপ এই কুরবানীও আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভের মাধ্যম হবে এবং আল্লাহ পাক দয়া করে রোগীর আরোগ্য দান করবেন। –কিফায়াতুল মুফতী : ৫/৮৫৫

মাসআলা : অনেকে জানের বদলে জান জরুরী মনে করে এবং সারারাত অসুস্থ ব্যক্তির নিকট বকরী ইত্যাদি বেঁধে রাখে। আবার অনেকে অসুস্থব্যক্তির হাত দ্বারা স্পর্শ করার পর বকরী সদকা করে অথবা অসুস্থের পাশে পশু যবাই করে তা গরীবদেরকে দান করে। তাদের ধারণা হলো অসুস্থ ব্যক্তি পশু স্পর্শ করার সাথে সাথে তার সমস্ত মুসিবত পশুর দিকে স্থানান্তর হয়ে যায়। এরপর সদকা করার দ্বারা ঐ সব বালামুসিবত দূরীভূত হয়ে যায়, ফলে জীবনের বিনিময়ে জীবন দেয়ার মাধ্যমে রোগীর জীবন বেঁচে যায়। স্মরণ রাখবে! এ ধারণা শরীয়ত বিরোধী।

মাসআলা : অসুস্থতার সময় অধিকাংশ সময় পশু যবাই করার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। অথচ আকীকা ব্যতীত এভাবে জীবনের বিনিময়ে জীবন উৎসর্গ করার কোন দৃষ্টান্ত প্রমাণিত নেই। যদিও বলা হয় জীবনের বিনিময়ে জীবন উৎসর্গ করা হয় না; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করা, হাদীস শরীফে যাকে বিপদ মুসীবত ও পেরেশানী দূর করার মাধ্যম হিসেবে বলা হয়েছে। আমি বলব, উদ্দেশ্য যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে পশু যবাই করার পরিবর্তে তার মূল্য সদকা করতে চায় না কেন? এ থেকে বোঝা যায় যে অন্তরে অবশ্যই চোর আছে যার কারণে এই ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে যে, রোগ দূর করার ক্ষেত্রে পশু যবাই বিশেষ কার্যকরী, আর এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, জীবনের

বিনিময়ে জীবন যথেষ্ট হয়ে যাবে। মহামারী কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অনেক লোক নজরানা হিসেবে ছাগল যবাই করে, এটা শিরকী কাজ। অনেকে আবার রোগ মুক্তিপণ হিসেবে ছাগল যবাই করে। এটা একেবারেই মিথ্যা ও বানোয়াট। —আগলাতুল আওয়াম : ২৩

মাসআলা : রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর জন্য মান্নত করা জায়েয। তবে মান্নত ছাড়া এমনিতেই দান সদকা করে আল্লাহর নিকট সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য দু'আ করতে থাকবে। —আপকে মাসায়েল : ৩/৪২১

মাসআলা : কোন অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ হতে ছাগল ছদকা করা এবং দ্রুত রুহ বের হওয়ার আশায় তার গোশত চীলকে দেয়া মূর্খদের আবিস্কৃত কুসংস্কার। শরীয়তে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এসব মন্ত্র অমুসলিমদের থেকে গৃহীত। এর গুনাহ মারাত্মক। তবে সাধারণত সদকার মাধ্যমে মুসিবত দূর হয়। আর নগদ টাকা সদকা করা অধিক উত্তম। চাই তা কোন ফকীর মিসকীনকে দেয়া হোক বা কোন কল্যাণমূলক নেক কাজে ব্যয় করা হোক। —আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৬৬

অসুস্থতা হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে ছাগল ছেড়ে দেয়া

মাসআলা : অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা লাভের আশায় বাজার থেকে ছাগল ক্রয় করে তা কোন জঙ্গল বা মরুভূমিতে ছেড়ে দেয়া এবং এই মনে করা যে, আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে একটা জীবন স্বাধীন করে ছেড়ে দিলাম এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা অসুস্থ ব্যক্তিকে বিপদমুক্ত করবেন। জীবনের বিনিময়ে জীবন যথেষ্ট হওয়ার এই আকীদা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন। এজাতীয় ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাস রাখা গুনাহ।

সদকা ও দান-খয়রাতের সহীহ পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহপাক যা কিছু সদকা করার সামর্থ দান করেন, অতি গোপনে কোন অভাবীকে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দান করা এবং আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে মুসিবত ও রোগ-ব্যাধি দূর করবেন মর্মে আশা রাখা। এর অতিরিক্ত অন্য কোন আকীদা ও বিশ্বাস রাখা গুনাহের কাজ। —বেহেস্তী যিওয়ার : ৬/৫৩

সদকার জন্য বিশেষ বস্তু নির্ধারণ করা

মাসআলা : অনেকে সদকা করার জন্য বিশেষ বস্তু নির্ধারন করে। যেমন : কালো রঙয়ের মাসকালাই ডাল সদকা করা। কালো রঙয়ের ডাল এ জন্যই নির্বাচন করা হয় যে, মুসিবত কালো আকৃতির আর এ ডালও কালো। সুতরাং কালোকে বিতাড়নের জন্য কালোই অধিক উপযুক্ত। এসব মন গড়া এবং শরীয়তবিরোধী কথাবার্তা। ইসলামী শরীয়তে সাধারণ সদকাই বিপদ মুসিবত দূরকারী। কোন নির্দিষ্ট বস্তু কিংবা নির্দিষ্ট রঙ শরীয়তে নির্ধারিত নেই। —আগলাতুল আওয়াম : ২৩

ইস্তেখারার ভুল সমূহ

মাসআলা : অতীত বা ভবিষ্যতের কোন ঘটনা জানার উদ্দেশ্যে অনেককে ইস্তেখারার জন্য বলতে দেখা যায়; প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শরীয়তে ইস্তেখারার উদ্দেশ্য এটা নয়। বরং ইস্তেখারা করা হয় কোন কাজ করা না করার বিষয়ে দোদুল্যমানতা দূর করার এবং কল্যাণকামিতার জন্য, কোন ঘটনা জানার জন্য নয়। উপরোক্ত ইস্তেখারার ফলাফলে বিশ্বাস রাখাও নাজায়েয।

ইস্তেখারার হাকীকত

সাধারণত মানুষ ইস্তেখারার হাকীকত বা বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ। মূলত ইস্তেখারার হাকীকত হচ্ছে এটি একটি দু'আ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্যাণের কাজে সহযোগিতা প্রার্থনা এবং ভালোর ফয়সালা চাওয়া। এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বান্দাহ এ দু'আ করে হে আল্লাহ! আমি যা করব তা যাতে কল্যাণকর হয়। আর যা আমার জন্য মঙ্গলজনক নয়, আমাকে তা থেকে দূরে রাখুন দিবেন না। ইস্তেখারা শেষ হওয়ার পর অন্তরের ঝোঁক কোন্ দিকে সে অনুযায়ী আমল করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে মনে করে অন্য দিক ছেড়ে দিতে হবে এমনটি আবশ্যক নয়; বরং অন্যান্য সুবিধা ও কল্যাণের দিক সামনে রেখে যে দিক প্রাধান্য পায় সে অনুযায়ী আমল করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করার স্বাধীনতাও রয়েছে। কেননা প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ অন্তরের ঝোঁক তথা 'ইলহাম' শরীয়তের দলীল হওয়ার দাবী উঠতে পারে। যা সহীহ নয়, সুতরাং এমনটি বুঝে থাকলে নিজের ভুল সংশোধন করে নিবে, কারণ তা একেবারেই ভ্রান্ত আকীদা।

(ইস্তেখারার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নিকট বান্দাহ তার উদ্দিষ্ট বিষয়ে কল্যাণ কামনা করা এবং অকল্যান ও ক্ষতিকর বিষয় হতে মুক্তি চাওয়া। ইস্তেখারার দু'টি আলামত ও প্রভাব প্রকাশ পায়। (ক) উদ্দিষ্ট বিষয়ে অন্তর স্থির হয়ে যায়, (খ) কল্যাণকর দিকের প্রয়োজনীয় আসবাব ও উপায় উপকরণ সহজ লভ্য হয়ে যায়। (এর বাইরে অন্য কোন ফায়েদা ও আলামত প্রকাশ পায়না) ইস্তেখারার পর স্বপ্নে দেখাও জরুরী নয়। –ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত)

মাসআলা : ইস্তেখারার মধ্যে আবশ্যক বিষয় দু'টি-দু' রাকাত নামায পড়া এবং ইস্তেখারার দু'আ পড়া। ইস্তেখারার পর শোয়া, স্বপ্ন দেখা মোটেও শর্ত নয়। এ সব কিছু সাধারণ্যের আবিস্কার। তবে কখনো কখনো ইস্তেখারার আলামত স্বপ্নের আকারে প্রকাশিত হয়; যদিও তা শর্ত নয়।

–আল ফসল ওয়াল ওয়াসল : ৪০০

মাসআলা : যে কোন নতুন কাজ করার প্রাক্কালে অনেকে ইস্তেখারা করার জন্য বলে থাকে, এটা সহীহ নয়। এক্ষেত্রে সহীহ কথা হচ্ছে ইস্তে খারা সকলের জন্য উপযোগী নয়; বরং চিন্তামুক্ত মানসিকতা নিয়ে ইস্তে খারা করাই উপকারী। অর্থাৎ মনের মধ্যে কোনো ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকতে পারবেনা। নতুবা অন্তরের এসব খেয়াল ও ধারণার কারণে অন্তর এ দিক সেদিক ঝুঁকে পড়বে। আর ওই লোক মনে করবে যে, ইস্তেখারার মাধ্যমেই তার এ সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছে। অথচ তার কল্পনার বিষয়গুলো স্বপ্ন আকারে প্রকাশিত হয়েছে। –আল ইফাযাত : ৪৩৫

মাসআলা : কোন কাজ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়ার পর নামমাত্র ইস্তেখারা করা ইস্তেখারার সঠিক পদ্ধতি নয়। কোনো কাজের সিদ্ধান্ত স্থির করার পূর্বেই ইস্তেখারা করতে হয়, যাতে এর দ্বারা কোন এক দিকে অন্তর স্থির হতে পারে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। এ বিষয়ে মানুষ ভুল করে থাকে।

মাসআলা : ইস্তেখারার জন্য রাত জরুরী নয়; এটা একটা রীতি সর্বস্ব, যা সাধারণ জনগণের আবিস্কার। ইস্তেখারা করার পর শোয়াও জরুরী নয়, তদ্রূপ রাতের বেলায় ইস্তেখারা হতে হবে, তাও আবশ্যক নয়, বরং যে কোন সময় যেমন : যোহরের সময় দু'রাকাত নফল নামায পড়ে দু'আয়ে মাসনূন পড়ে কিছু সময় অন্তরের দিকে মনোনিবেশ করে বসবে।এটাই যথেষ্ট।

মাসআলা : দোদুল্যমানতা দূর করার জন্যই ইস্তেখারা করা হয়। আর দোদুল্যমানতা হচ্ছে কাজটি করা না করার সুবিধার দিক সমান সমান হওয়া। তো কোন একটি দিকের প্রয়োজনীয়তা ও প্রধাণ্যতা নির্ধারণ হয়ে গেলে ইস্তেখরার প্রয়োজন বাকী থাকে না।

মাসআলা : একই দিনে যে কয়বার ইচ্ছা ইস্তেখারা করা যায়। তবে একবার করাই যথেষ্ট। হাদীস শরীফে একবারের কথাই এসেছে। তবে একাধিক বারের ব্যাপারেও নিষেধ করা হয় নি।

পবিত্র কুরআন থেকে ফাল বা শুভলক্ষণ বের করা

হাদীস শরীফ এবং উম্মতের ইসলামী পন্ডিত আকাবির হযরতদের কর্মপন্থা দ্বারা যে 'ফাল' বা শুভলক্ষণ বের করা প্রমাণিত তা হচেছ কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে চিন্তা-পেরেশানিতে লিপ্ত। ইত্যবসরে আচমকা কিংবা ইচ্ছাকৃত বিশেষ পদ্ধতিতে কোন আনন্দ বা সফলতার শব্দ তার কানে এসে পড়ল বা দৃষ্টিগোচর হলো, তখন ওই শব্দের কারণে আল্লাহর রহমতের আশা আরো প্রবল হয়।

সর্বোপরি 'ফাল' এর বাস্তবতা এতটুকু যে, এর দ্বারা আল্লাহর রহমতের আশা করা। এছাড়া অন্যান্য যে সব কুসংস্কার সংযোজন করা হয়েছে তা নব আবিস্কার ও বিদআত। অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের প্রবল আশা রাখা চাই। এর বাইরে যতসব কুসংস্কার বর্জন করা জরুরী।

–আগলাতুল আওয়াম : ৩২

মাসআলা : অনেক 'ফাল' দেখা লোক এবং এ জাতীয় মজলিসে যেসব সধারণ জনগণ উপস্থিত থাকে তারা মনে করে যে, কেমন যেন এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফেই সংবাদ দিয়েছেন। তাই এর বিপরীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আরো দুঃসাহসের সাথে বলে থাকে আরে মিয়া! কুরআন মাজিদে ভুল লিখেছে নাকি? (নাউযুবিল্লাহ)

–আগলাতুল আওয়াম : ৩১, মাযাহেরে হক : ৫/২৯২

তদবীরের কিতাব থেকে ফাল তোলা

মাসআলা : নেক ফাল তোলা যাবে তবে এটাকে নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করা যাবে না। গণক ও জোতিষীর নিকট গিয়ে ফাল তোলা এবং তাদের থেকে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া কবীরা গুনাহ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর নিকট যায় এবং তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, উক্ত ব্যক্তি অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত দ্বীন হতে বেরিয়ে পড়ল।" অর্থাৎ কাফের হয়ে গেল। আর এই ধমকীটা জ্যোতির্বিদ্যা হালাল মনে করার কারণে উচ্চারিত হয়েছে অথবা কঠোরতা বুঝানোর জন্য এমনটি বলা হয়েছে।

—মাযাহেরে হক : ৪/৩০, ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪৭০,
ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৮/৬১

মাসআলা : কুরআনে কারীম থেকে ফাল তোলা বৈধ নয়। অন্য কোন কিতাব যেমন দিওয়ানে হাফেয বা গুলিস্তা ইত্যাদি থেকেও ফাল তোলা জায়েয নয়। উল্লেখ্য কুরআনে কারীম থেকে ফাল তোলা জঘন্যতম অপরাধ ও গুনাহের কাজ। কারণ কখনো কখনো এ কেন্দ্রিক কুরআন মাজীদের বে-ইজ্জতী হয় কিংবা কখনো কুরআনের ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। —কেফায়াতুল মুফতী : ৯/২২১

মাসআলা : সুন্নত পদ্ধতিতে ইস্তেখারা করা সুন্নত। হাদীস শরীফে এ বিষয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তবে ফাল তোলা জায়েয নয়।

—আপকে মাসায়েল : ১/৩৬৩

তাবিজ কবজ এর শরঈ বিধান

মাসআলা : তাবিজ কবজ এর ক্রিয়া রয়েছে তবে এ ক্রিয়ার প্রভাবটা আল্লাহ তা'আলার আদেশেই হয়ে থাকে। কারো ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে যে তাবিজ করা হয় তা যাদুর ন্যায় হারাম। এটা করা এবং করানো উভয়টাই হারাম এবং কবীরা গুনাহ; এমনকি এর দ্বারা কুফরীরও আশঙ্কা রয়েছে। কোন বৈধ উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করা জায়েয আছে, তবে শর্ত হচ্ছে এতে কোন গুনাহ কিংবা শিরক সম্বলিত কথা লেখা থাকতে পারবে না। অতএব তাবিজ এর বৈধতার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে-

১। কোন জায়েয উদ্দেশ্য হতে হবে, নাজায়েয উদ্দেশ্যে হতে পারবে না

২। তাবিজের শব্দ ও বাক্যসমূহ কুফর-শিরকমুক্ত হতে হবে। যদি এমন কোন শব্দ বা বাক্য থাকে যা দূর্বোধ্য তাও বৈধ নয়।

৩। তাবিজকেই স্বয়ং প্রতিক্রিয়াশীল মনে করা যাবে না।

—আপকে মাসায়েল : ১/৩৫১

মহামারী প্রতিহত করার লক্ষ্যে لی خمسة اطفی بها পড়া কিংবা তাবিজ আকারে লিখা বৈধ নয়।

মাসআলা : এই তাবিজ লাগানো বৈধ নয়, তা শিরক।

—আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৪৮

মাসআলা : কিছু কিছু তাবিজ নিষেধ। তন্মধ্যে মহমারীর প্রসিদ্ধ তাবিজ অন্যতম। তা হচ্ছে—

لی خمسة اطفی بها حر الو باء الحاطمه

المصطفی والمرتضی وابناهما و الفاطمة

অর্থাৎ আমার পাঁচজন বিশিষ্ট লোক আছেন যাদের দিয়ে আমি কঠিন মহমারীকে রোধ করব। তারা হলেন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আলী রাযি, হযরত হাসান, হযরত হোসাইন রাযি. এবং হযরত ফাতেমা রাযি.। কোনরূপ ব্যাখ্যা না করা হলে এর বিষয় বস্তু শিরক হয়ে যায়।

তাবিজের বিনিময় নেয়া

কুরআনে কারীমের আয়াত পাঠ করে ঝাড়ফুক করার আলোচনা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীতে উম্মতের নেক বান্দাহগণের আমলও এমনটির প্রমাণ বহন করে আসছে। তাবিজও তারই একটি প্রকার। তাই এর বৈধতার বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তাবিজ কী? এর বাস্তবতা কতটুকু তা অবশ্যই জেনে নেয়া চাই। অনেকে তাবিজের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে; এটা ঠিক নয়। কেননা অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় তাবিজও চিকিৎসার একটি প্রকার মাত্র। তা উপকারী হওয়া না হওয়া আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

কেউ কেউ তাবিজকে রুহানী আমল মনে করে, এই ধারণাও সংশোধন করা চাই। রূহানিয়ত বা আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন জিনিস, আর তাবিজ হচ্ছে দুনিয়াবী চিকিৎসা মাত্র। এজন্য তাবিজদাতাকে বুযূর্গ মনে করা ভুল। অনেকে দু'আর ব্যাপারে এতটুকু বিশ্বাস রাখে না, যতটুকু রাখে তাবিজের ওপর। এ ধারণাও ভুল এবং অবশ্যই সংশোধনযোগ্য। দু'আ হচ্ছে ইবাদত, তাবিজ করা কোন ইবাদত নয়। আর কোন নাজায়েয উদ্দেশ্যে তাবিজ করা হারাম। —আপকে মাসায়েল : ১/৩৫২

মাসআলা : দু'আ এক প্রকার ইবাদত, তাই এর বিনিময় চাওয়া ভুল। এছাড়া দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে তদবীর ও তাবিজ কবজ সহ যেসব চিকিৎসা দেয়া হয় সেগুলো ইবাদত নয়, বরং দুনিয়াবী তদবীর ও চিকিৎসা। আর এর বিনিময় দেয়া নেয়া উভয়টাই বৈধ।

মাসআলা : আল্লাহর নাম কিংবা কুরআনের আয়াত খোদাইকৃত আংটি পরে টয়লেটে প্রবেশ করা মাকরূহ। —আলমগীরী : ১/৫০

আয়াতুল কুরসী পড়ে তালি বাজানো

প্রশ্ন : আমাদের ঘরে ঘুমানোর পূর্বে প্রতিনিয়ত আয়াতুল কুরসী পাঠ করে সজোরে তালি বাজানো হয়। তালির আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে, মুসিবত এবং চোর থেকে ঘর তত নিরাপদ থাকবে বলে এই আকীদা পোষণ করা হয়। এভাবে তালি বাজানোর শরঈ বিধান কী? জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

উত্তর : এভাবে তালি বাজানো হারাম। আর তালি বাজানোর দ্বারা বিপদ দূর হওয়া এবং চোর পালিয়ে যাওয়ার যে আকীদা পোষণ করা হয় তা মূর্খতা ও তাদের আবিস্কৃত কুসংস্কার। উল্লেখ্য আয়াতুল কুরসী পড়া অনেক বড় ফযীলতপূর্ণ আমল আর তা বিপদ থেকে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যমও বটে। —আপকে মাসায়েল : ৮/২৭২

হাদীস শরীফে এসেছে কোন ঘরে যদি শয়তানী বদ আছর থাকে আর সে ঘরে আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করা হয় তবে শয়তানের ঐ কুপ্রভাব দূর হয়ে যায়। —আত্তারগীব ওয়াততারহীব : ৩/৩৪৯

ইসলামে অশুভ ও কুলক্ষণের অবস্থান

প্রশ্ন : ইসলামে কুলক্ষণ এর কোন অস্তিত্ব আছে কিনা? অনেকে পায়ের ওপর পা রাখাকে, কেউ কেউ আঙ্গুল ফুটানোকে, আবার অনেকে হাই তোলাকে অশুভ মনে করে। আর কেউ কেউ নির্দিষ্ট কোন দিনকে অশুভ মনে করে থাকে এগুলোর বিধান কী?

উত্তর : ইসলামে অশুভ ও কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। এটা নিছক খারাপ ধারণা, হাদীস শরীফে 'অশুভ' এ আকীদা বিশ্বাসকে খন্ডন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের বদ আমল, তার পাপাচার এবং কুকর্ম যে গুলো বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ঘরে ঘরে হচ্ছে সেগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অশুভ বিষয়।

আর এসব বদআমল এবং নাফরমানী আল্লাহর আযাব ও শাস্তির কারণ। এ থেকে বাঁচা জরুরী। ইসলাম অশুভ বা কুলক্ষণকে মোটেও সমর্থন করে না। অতএব কোন কাজ কিংবা দিনকে অশুভ বলা একেবারেই ভুল। যদিও আঙ্গুল ফুটানো ঠিক নয়; কিন্তু তা অশুভ নয়। এমনিভাবে হাই আসলে মুখে হাত রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু হাই তোলাকে কুলক্ষণ বলা হয় নি।

মাসআলা : পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণে সাধারণ মানুষের অতিরিক্ত আনন্দিত হওয়া এক স্বভাবজাত বিষয়। কিন্তু তাই বলে কন্যা জন্ম নিলে তাদেরকে বা তাদের 'মা' কে অশুভ মনে করা কিংবা তাদের সাথে তাচ্ছিল্যের আচরণ করা গুনাহ।

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا

অর্থ: আল্লাহ পাক যাকে খুশী পুত্র সন্তান দান করেন আর যাকে খুশী কণ্যা সন্তান দান করে, তদ্রূপ যাকে খুশী পুত্র কণ্যা উভয়টাই দান করেন।

–সূরা শু'রা : ৪৯

এতে একচ্ছত্র ক্ষমতা আল্লাহ পাকের। বান্দাহর কোনো হাত নেই। তাই কণ্যা সন্তানের জন্মের সংবাদ শুনে নারাজ হওয়া আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হওয়ার নামান্তর।

মাসআলা : বিভিন্ন রঙয়ের চুড়ি এবং কাপড় পরিধান করা জায়েয আছে। কিন্তু অমুক রঙ এর সাথে এই মুসিবত আছে, এ জাতীয় বিশ্বাস

রাখা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। রঙ থেকে কিছুই হয় না; বরং আমলের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয় আবার বিতাড়িতও হয়।

মাসআলা : মুহাররম, সফর, শা'বান, শাওয়াল, যিলকদ এবং যিলহজ্জ মাসকে অশুভ মনে করে এসব মাসে বিবাহ না করা ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারে গর্হিত ও ভিত্তিহীন আকীদা। মুহাররম মাসে ইমাম হোসাইন রাযি.-এর শাহাদাত সংঘটিত হয়েছে তাই এ মাসে বিবাহশাদী করা যাবে না, এমন কিছু আবশ্যক নয়। অন্যথায় প্রত্যেক মাসেই এমন কারো না কারো ইন্তেকাল হয়েছে যারা হযরত হোসাইন রাযি. থেকেও বড় বুযুর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই বলে বছরের ১২ মাসের কোন সময়েই বিবাহ করা যাবে না। সুতরাং শাহাদাতের মাস সমূহকে শোক এবং অশুভ মাস মনে করা একেবারেই ভুল।

মাসআলা : সপ্তাহের প্রত্যেক দিনেই সুরমা লাগানো যাবে, এর জন্য কোন দিনক্ষণ নির্ধারিত নেই।

মাসআলা : 'আসর' ও 'মাগরিবের' মধ্যবর্তী সময়ে খাওয়া দাওয়ার ওপর কোন বিধি নিষেধ বা কারাহাত নেই। আসর মাগরিবের মাঝখানে খাওয়া দাওয়া না করার কারণে রোযার সাওয়াব পাওয়া যায় এই কথাটিও ভিত্তিহীন। —আপকে মাসায়েল আওর ওনকা হল : ১/৩৫৮

মাসআলা : গোধূলীর সময় মোরগ ডাকলে তা যবাই করে দেয়ার বিষয়টি সাধারণ্যের মাঝে প্রসিদ্ধ। তারা মনে করে এ সময়ের মোরগের ডাক অশুভ, এর দ্বারা মহামারী বিস্তৃত হয়, কথাটির কোন ভিত্তি নেই। তদ্রূপ মোরগ আযান দিলেও তাকে অমঙ্গলজনক মনে করে যবাই করার কথাও শোনা যায়, এটাও ভিত্তিহীন।

মাসাআলা : অনেকে ধূমকেতুর আগমনকে অশুভ মনে করে। তারা বলে এ তারকা উদ্ভাসিত হলে মানুষের ওপর মুসিবত আসে এবং দেশে যুদ্ধ বেধে যায়। এটা একেবারেই ভুল এবং জ্যোতিষ চিন্তা। শরীয়তে এসব ধারণাকে ভ্রান্ত বলা হয়েছে।

মাসআলা : অনেকে মঙ্গলবারকে অশুভ দিন মনে করে। এটাও ভিত্তিহীন। কোন দিনই অশুভ নয়।

মাসআলা : চড়ুই পাখি পানিতে গোসল করাকে বৃষ্টির লক্ষণ মনে করা, তদ্রূপ ময়ূরের ডাককে বৃষ্টির লক্ষণ মনে করাও ভিত্তিহীন।

মাসআলা : প্রত্যুষে কাউকে গালি দেয়া, আঘাত করা, কিংবা কষ্ট দেয়া হলে সারাদিন ঐ ভাবে কাটবে বলে লক্ষণ স্থির করা ভিত্তিহীন ও শরীয়ত বিরোধী।

মাসআলা : রাতের বেলায় কুকুরের ক্রন্দন শুনে অনেকে মনে করে যে, আগামীকাল সকালে এ বসতিতে কারো মৃত্যু সংঘটিত হবে। এটা ভুল ধারণা।

মাসআলা : যখন হাঁচি আসে তখন ঐ লোককে কবর স্মরণ করে বলে যে কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে তা ভুল। হাঁচি আসার কারণ এটা নয়।

মাসআলা : কারো অনুপস্থিতিতে তার আলোচনা করার সময় কিংবা কিছুক্ষণ পর ঐ লোক আলোচনা স্থলে উপস্থিত হলে বলা হয় যে, এ লোক দীর্ঘ হায়াত লাভ করবে। শরীয়তে এমন কথার কোন ভিত্তি নেই।

কুলক্ষণ সংশ্লিষ্ট কিছু মাসাআলা

মাসআলা : অনেক সাধারণ লোক মনে করে পুরুষের বাম চোখ এবং নারীর ডান চোখ চঞ্চল্ হলে অর্থাৎ নাচানাচি করলে বিপদ মুসিবত, পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা আসে। এর বিপরীত হলে আনন্দ ও সুখ আসে এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর কোন শরঈ প্রমাণ নেই।

মাসআলা : অধিকাংশ সাধারণ মানুষ বলে যে, হাতের তালু চুলকালে সম্পদ অর্জিত হয়। আর পায়ের তালু চুলকালে কিংবা জুতার ওপর জুতা পড়লে সফর করতে হয়। এসব কথাও ভিত্তিহীন ও কুলক্ষণের কথা।

মাসআলা : অনেক মহিলা ঘরের চালে কাক ডাকলে মেহমান আসে বলে মনে করে। এ ধারণা করাও গুনাহ।

মাসআলা : অনেকে সকাল বেলায় কিছু প্রাণীর নাম নেয়াকে অশুভ মনে করে। যেমন : সাপ, শুকর ইত্যাদি-এটাও ভ্রান্ত কথা।

মাসআলা : অন্যের হাতের ঝাড়ু গায়ে লাগাকে অনেকে জঘন্যতম আয়ব ও দোষ মনে করে। এটাকে খুব খারাপ জেনে প্রতিপক্ষকে বলে আমি কুপে লবন ঢেলে দেব এতে তোমার চেহারায় ছাই পড়ে যাবে। এটাও একটা ভিত্তিহীন ধারণা। তেমনিভাবে কারো গায়ে ঝাড়ু মারা হলে

ঐ লোকের দেহ শুকিয়ে যায় এজন্য ঝাড়ুর উপর থুথু নিক্ষেপ করতে হয় এটিও ভিত্তিহীন ও শরীয়ত বিরোধী কথা।

মাসআলা : অনেকে মনে করে যাকে ঢেউয়া নিক্ষেপ করা তার ক্ষুধা বেড়ে যাওয়ার কারণে তাকে বারবার খানা খেতে হয়। এটাও শরীয়তবিরোধী ভিত্তিহীন আকীদা।

মাসআলা : কোন ব্যক্তি কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর পেছন দিক থেকে ডাকলে অনেকে খুব রেগে যায়। তারা মনে করে, যাত্রাপথে পেছন দিক থেকে ডাকলে ঐ যাত্রা ও কাজ সফল হয় না। এ কথার শরয়ী কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা : অনেকের নিয়ম হলো যাত্রা শুরু করার পর কেউ হাঁচি দিলে যাত্রা বন্ধ করে ফেরত চলে আসে। তাদের ধারণা হাঁচি দ্বারা বুঝা যায় যে, উদ্দিষ্ট কাজ সফল হবে না। এটাও ভুল।

মাসআলা : কোন কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার প্রাক্কালে বিড়াল সামনে পড়লে ঐ কাজ বিফল হয় মর্মে অনেকে বিশ্বাস পোষণ করে। এটি ভ্রান্ত ধারণা। –আগলাতুল আওয়াম : ২৫

মাসআলা : বহু দোকানদার দিনের শুরুতে সকাল বেলায় বাকিতে মাল বিক্রি করে না। তারা মনে করে সকাল বেলায় যদি বাকি দেয়া হয় তাহলে সারাদিন বাকীতেই বিক্রি হবে। এটি কুলক্ষণ গ্রহণ ছাড়া কিছুই নয়। তবে বিশেষ কোন কল্যাণের দিক বিবেচনায় বাকীতে বিক্রি না করলে সেটা ভিন্ন কথা।

মাসাআলা : যে ঘরে মাকড়সার জাল বেশি হয়, সে ঘরের অধিবাসীরা ঋণগ্রস্থ হয়ে যায় বলে যে কথা সমাজে প্রচলিত, তা শরীয়ত বিরোধী এবং ভিত্তিহীন। হ্যাঁ! ঘরকে মাকড়সার জাল ইত্যাদি থেকে পরিচ্ছন্ন রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও প্রিয়।

–আগলাতুল আওয়াম : ৩৮

মাসআলা : রাস্তায় চলার পথে কালো বিড়াল সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে সামনে অগ্রসর হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয়। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। –আপকে মাসায়েল : ১/৩৭৬

মাসআলা : অনেকে বিশেষ দিন বা বিশেষ সময়ে সফর করা কল্যাণ কর বা অকল্যানকর মনে করে। এটি কাফের এবং জ্যোতিষীদের বিশ্বাস, শরীয়তে এর কোন প্রমাণ নেই।

মাসআলা : কোন কোন মহিলা মনে করে যে, নতুন বউ যদি নিজের ঘরে বা সিন্দুকে তালা লাগায় তবে ঐ ঘর বিরান হয়ে যায়। এটাও ভিত্তিহীন। —আগলাতুল আওয়াম : ২৭

মাসআলা : ঝাড়ু-দাঁড় করিয়ে না রাখা, রাতের বেলায় ঝাড়ু না দেয়া, চৌকি বা খাটের চাদর লম্বালম্বি দিকে দাড়িয়ে না বিছানো, জুতার উপর জুতা না রাখা, রাতের বেলায় নখ না কাটা, মঙ্গলবার চুল ও নখ ইত্যাদি না কাটা, খানা খেয়ে ঝাড়ু না দেয়া। ইসলামী শরীয়তে এসবের কোন ভিত্তি নেই; বরং এগুলো নিছক ধারণা ও মনগড়া কুসংস্কার।

মাসআলা : সূর্যাস্তের সাথে সাথে চেরাগ ইত্যাদি জ্বালানো জরুরী মনে করা প্রবৃত্তি পূজা ব্যতীত কিছু নয়।

মাসআলা : জায়নামাযের কোন এক কোণা গুটিয়ে রাখার দ্বারা শয়তানকে ইবাদত থেকে প্রতিহত করার ধারণাও ভুল ও ভিত্তিহীন।

জায়নামাযের কোণা গুটানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নামায শেষ হওয়ার পর জায়নামায বিছানো অবস্থায় থেকে যাতে নষ্ট বা ময়লাযুক্ত না হয়ে যায়। কিন্তু জায়নামায গুটানো না হলে শয়তান তাতে নামায পড়ে বলে জনসাধারণের যে বিশ্বাস তা ভুল ও ভিত্তিহীন।

মাসাআলা : জমিনে লবন পড়লে কোন ক্ষতি হয় না। তবে লবন যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত তাই ইচ্ছাকৃত লবন ফেলা খারাপ কাজ। কিন্তু জমিনে লবন ফেলা হলে পলক দ্বারা কিয়ামতের দিন তা উঠাতে হবে আর গরম পানি ঢালাতে কোন অসুবিধা নেই মর্মে যে আকীদা জনসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা ভিত্তিহীন।

—আপকে মাসায়েল : ১/১১১

মাসআলা : যে মহিলার প্রথম বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় মুছিবত হতে নিরাপত্তার জন্য তার নিকট তলোয়ার বা ছুরি রেখে দেয়া হয়। এটাও শিরকী কাজ, অবশ্যই বর্জনীয়। —বেহেস্তী যিওয়ার : ৬/৮

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখার বিধান

যে ব্যক্তি নামায রোযার পাবন্দি করে অথচ সে কাদিয়ানীদের সাথে সম্পর্ক রাখে, যদি আন্তরিকভাবেই সে কাদিয়ানীদেরকে ভাল এবং হক মনে করে তাহলে সে মুরতাদ বলে সাব্যস্ত হবে। এর সাথে সম্পর্ক রাখা নাজায়েয। পক্ষান্তরে যদি সে কাদিয়ানীদের আকীদার সাথে ঐক্যমত পোষণকারী না হয় এবং তাদেরকে ভালোও মনে না করে; বরং ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দুনিয়াবী লেনদেনের সীমা পর্যন্তই তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে তাহলে সেক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, যে কাদিয়ানীর সাথে তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক সে যদি পূর্ব থেকে মুসলমান থাকে; কিন্তু পরবর্তীতে মুরতাদ হয়ে যায়, আর তার আকীদাও সহীহ না হয়, তবে তার সাথে বাণিজ্য করলে তার বাণিজ্যই সহীহ হবে না। —ফাতাওয়া শামী : ৩/৩১১

আর যদি ঐ কাদিয়ানী মুরতাদ কিংবা মুরতাদের সন্তান না হয় বরং বাপ-দাদা এবং পূর্ব পুরুষ থেকেই ভ্রান্ত আকীদা লালন করে আসে তবে এমন কাদিয়ানীরা মালের মালিক হলেও এদের সাথে কারবার করা জায়েয নয়। কেননা ব্যবসার মাধ্যমে তাকে এক ধরনের সহযোগিতা করা হয়। এছাড়া কাদিয়ানীদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে সাধারণ মানুষ মনে করবে কাদিয়ানীরা মুসলমানদেরই একটি গ্রুপ, আর কাদিয়ানীরাও মুসলিম সমাজে নিজেদের শিকড় বিস্তৃত করার সুযোগ পেয়ে বসবে। তাই কাদিয়ানীদের সাথে সবধরনের লেনদেন এবং উঠা বসা বর্জন করে তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা জরুরী। তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীরা মন্দ ও ভর্ৎসনাযোগ্য। তাদেরকে খারাপ মনে করেই সম্পর্ক রাখুক না কেন। অন্যান্য মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে এদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে কাদীয়ানীদের সঙ্গ ত্যাগ করানো। —আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৪৬

মাসআলা : কাদিয়ানীর বিধান মুরতাদ এর ন্যায়। তাদের ঘরে খাওয়া-দাওয়া বা তাদের সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবে না।

—আপকে মাসায়েল : ১/৭১

মান্নত এর সংজ্ঞা

নযর বলা হয় শর্ত সাপেক্ষে কোন ইবাদত নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়া। যেমন: যদি অমুক কাজ হয় তাহলে আমি এত রাকাত নফল নামায পড়বো, বায়তুলাহ শরীফের হজ্জ করবো কিংবা এত টাকা গরীবদেরকে দান করবো। এটাই মান্নত। —আপকে মাসায়েল : ৩/৪১৯

কিছু নারী পুরুষের মুর্খতা এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যার কোন সীমা থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়লে মান্নত করে বসে আয় আল্লাহ! আপনি যদি আমার বাচ্চাকে সুস্থ করে দেন তবে আমি আপনার নামে এই এই বস্তুর মান্নত করছি। কিন্তু পরবর্তীতে বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেলে মান্নত ও নযরানা নিয়ে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সাথে বাবার দরগাহে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার কুফরী ও শিরকী কাজে মত্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহপাক যদি বাচ্চার মৃত্যু দান করেন তখন সব বদনাম আল্লাহর উপর পড়ে, দরগাহ ওয়ালা ঐ ওলীর কোন দোষ দেয় না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে ভাই! তোমার বাচ্চার জন্য তুমি এত চেষ্টা তদবীর করেছো, কুফরী, শিরকী এবং বিদআতসহ হেন কাজ ছাড়নি তার পরও বাচ্চা সুস্থ হয়নি? তখন জবাবে বলে আরে ভাই! আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে আমাদের এসব চেষ্টা তদবীর কীভাবে আরাম পৌছাবে।

দেখুন কতবড় মূর্খতা! নিজেই জানে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ সুস্থ করার ক্ষমতা রাখে না, তারপরও বাবাদের দরবারে গিয়ে ধরনা দেয়। বহু মুর্খলোক আউলিয়ায়ে কেরাম, ফেরেস্তাগণ এবং অন্যান্য বড় বস্তুকেও তাদের প্রয়োজন পূরনের ক্ষমতা রাখে বলে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, যদি আমরা এদের পূজা না করি তবে আমাদের কাজ কারবারে সমস্যা দেখা দিবে এবং আমাদের ক্ষতি ও কষ্ট হবে। তাদের পুজার দ্বারা কখনো কখনো উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া কিংবা পূজা অর্চনার কমতির কারণে কাকতালীয়ভাবে কোন দূর্ঘটনা বা বিপদ আসার ফলে এই ভ্রান্ত ধারণার পক্ষে আরো শক্তিশালী প্রমাণ হয়ে যায়। মূলত এ হচ্ছে চিন্তার ফল এর অধিক কিছু নয়। যেমনিভাবে কোন একাকী জায়গায় সাধারণত মানুষ মুরদা থেকে ভয় পায়, তদ্রূপ এ সব লোকের লাভ ক্ষতির যে কু-ধারণা তাই এর ধারণা শক্তিকে উসকে দেয়।

মোটকথা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য মান্নত করা জায়েয নেই, চাই ফেরেস্তা হোক বা নবী। (মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমী)

মাসআলা : শিরক এর প্রকার গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণে সাহায্য প্রার্থনা করা। যেমন রোগীর সুস্থতা, অভাবীর জন্য গায়রুল্লাহর নিকট ধনসম্পদ চাওয়া অথবা গায়রুল্লাহ এর নামে মান্নত করা, আর বিশ্বাস রাখা যে, আমাদের মান্নতের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধন হবে। অথবা গায়রুল্লাহর নামের অযীফা বানিয়ে নেয়া। –ফাতাওয়া রশীদিয়া : ১/৩৭, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ. : ৬২,

মান্নত এর শর্তাবলী

মাসআলা : শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে মান্নত মানা জায়েয। তবে এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

১। মান্নত আল্লাহ তা'আলার নামে হতে হবে। গায়রুল্লাহর নামে মান্নত জায়েয নেই, এটি গুনাহের কাজ।

২। ইবাদতের মান্নত হতে হবে। যে কাজ ইবাদত এর অন্তর্ভুক্ত নয় তার মান্নত করা সহীহ নয়।

৩। ইবাদতটা ফরয, ওয়াজিব এর শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও কুরবানী ইত্যাদি। যে ইবাদত ফরয বা ওয়াজিব এর শ্রেণীভুক্ত নয়, তার মান্নত সহীহ নয়। –আপকে মাসায়েল : ৩/৪১৯

মাসআলা : কোন কথা বা উদ্দেশ্য মনে আসার দ্বারাই মান্নত হয়ে যায় না; বরং মৌখিকভাবে বলার দ্বারাই তা সংঘটিত হয়।

মান্নতকৃত কাজ হওয়ার পূর্বেই মান্নত আদায় করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি মান্নত করে যে, আমার অমুক কাজ হওয়ার পর আমি রোযা রাখবো বা নফল নামায পড়বো। উক্ত ব্যক্তি কাজ হওয়ার পর মান্নত পূর্ণ করবে? নাকি পূর্বেই তা আদায় করতে পারবে?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার নামে মান্নত করা জায়েয আছে। আর উদ্দেশ্য সাধন হওয়ার পরই মান্নত আদায় করা জরুরী হয়, এর আগে

নয়। উদ্দেশ্য সাধন এবং কাজ হওয়ার পূর্বে মান্নত আদায় করা সহীহ নয়। অতএব কাজ হওয়ার পূর্বেই যদি মান্নতের রোযা রেখে থাকে আর পরবর্তীতে কাজ হয়ে যায় তাহলে পুনরায় রোযা রাখা জরুরী হবে।

–আপকে মাসায়েল : ৩/৪২৫, ফাতাওয়া রশীদিয়া : ৫৪৭

মাসআলা : মান্নত করা জায়েয হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পছন্দ করতেন না। তাই মান্নতের পরিবর্তে নগদ সদকা করা উত্তম। তবে সদকা করতে হবে পবিত্র সম্পদ থেকে। অপবিত্র এবং হারাম সম্পদ থেকে কৃত সদকা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয় না।

–আপকে মাসায়েল : ৩/৪২০

মাসআলা : হারাম সম্পদ এর সদকা কবুল হয় না। উপরন্তু তা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে "আল্লাহ তা'আলা নিজেই পবিত্র তাই পবিত্র জিনিসই তিনি কবুল করেন। হারাম সম্পদ এর সদকার দৃষ্টান্ত হলো নাপাক ও পঁচা জিনিস এর জুড়ি কোন বাদশাহ এর সামনে পেশ করার ন্যায়। একথা স্পষ্ট যে, উক্ত হাদীয়া পেয়ে বাদশাহ খুশী তো হবেনই না; বরং উল্টা নারাজ ও ক্রোধান্বিত হবেন।

–আপকে মাসায়েল : ৩/৪৪২

সদকা এবং মান্নতের মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন : সদকা ও মান্নতের মাঝে পার্থক্য কী?

উত্তর : নিজের ওপর কোন বিষয় আবশ্যক করাকে মান্নত বলে। যেমন : কেউ মান্নত করল যদি আমার এ কাজটা হয়ে যায় তবে আমি এত টাকা সদকা করবো। কাজ হয়ে যাওয়ার পর মান্নতকৃত টাকা সদকা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, নিজের ওপর আবশ্যক না করেই আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করাকে সদকা বলে। মূলত মান্নততো সদকাই; তবে এটি হচ্ছে ওয়াজিব সদকা। আর সাধারণ সদকা সমূহ ওয়াজিব নয়।

–আপকে মাসায়েল : ৩/৪১৮

মান্নত এর বিধি-বিধান যাকাতের বিধি-বিধানের ন্যায়। শুধু গরীব মিসকীন এবং যাকাত ব্যয়ের খাত সমূহেই তা ব্যয় হবে। কোন ধনী লোক তা খেতে পারবে না।

–আপকে মাসায়েল : ৩/৪১৮

সদকার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

মাসআলা : আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় গরীব, মিসকীনদেরকে যে সম্পদ দেয়া হয় বা কল্যাণমূলক কোন কাজে ব্যয় করা হয় তাকে সদকা বলে। সদকা তিন প্রকার-১। ফরয, যেমন : যাকাত, ২। ওয়াজিব, যেমন : মান্নত, সদকায়ে ফিতর এবং কুরবানী ইত্যাদি। ৩। নফল সদকা, যেমন- সাধারণ দান খয়রাত ইত্যাদি।

–আপকে মাসায়েল : ৩/৪১৮

ভুল মান্নত এর বিধান

মাসআলা : অনেকে গুনাহের কাজের মান্নত করে থাকে। যেমন : যদি আমার ছেলে ভালো হয় তাহলে আমি নাচের আসর করব- এ ধরনের মান্নত অকার্যকর। এগুলো পূরা করা জায়েয নয়। –ফুরূউল ঈমান : ৪১

মাসআলা : অনেকে মাকরূহ এবং বিদআত এর মান্নত করে। যেমন : নিজ পুত্রকে ইমাম হোসাইন রাযি.-এর ফকীর বানানো, কারো নামে মাথায় খোপা রাখা, কানেরফুল ব্যবহার করা, কোন মাযারে গিলাফ পাঠানো সহ নানান ধরনের ভ্রান্ত বিষয়ের মান্নতের প্রচল রয়েছে। শরীয়তে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। –আগলাতুল আওয়াম : ১৪১

মাসআলা : মাযারে সালাম দেয়ার মান্নত করা এবং তা পূরণ করা কোনটাই জায়েয নয়। যদি কেউ মাযারে সালাম করার মান্নত করে এই মান্নত শুদ্ধ নয়। এবং তা পুরা করা বৈধ নয়। –আপকে মাসায়েল : ৩/৪২১

মাসআলা : অনেক মহিলা এভাবে মান্নত করে, 'যদি আমার অমুক উদ্দেশ্য পুরা হয় তবে মসজিদে গিয়ে সালাম করব, আবার কেউ বলে মসজিদের তাক মিষ্টি দ্বারা ভরে দেব। উদ্দেশ্য সফল হলে মসজিদে গিয়ে মান্নত পূর্ণ করে। এটি একেবারেই ভুল। তা না করে বরং মসজিদে গিয়ে নফল পড়ে অন্তর থেকে আল্লাহর শোকর আদায় করলেই মসজিদের সালামের হক আদায় হয়ে যাবে। এগুলো ঘরেও আদায় করা যায় মসজিদে যাওয়া জরুরি নয়। আর মসজিদের তাক মিষ্টি দ্বারা পূর্ণ করার পরিবর্তে সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করে দিবে। এ কাজ ঘরে বসেই সম্ভব এর জন্য মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

–আগলাতুল আওয়াম : ১১৮

মাসআলা : মহিলারা নফল ঘরেই আদায় করবে মসজিদে যাবে না। কারণ মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার চেয়ে নিজ ঘরের অন্দর মহলে নামায পড়ার সওয়াব অনেক বেশি। —অনুবাদক

মাসআলা : অনেকে গায়রুল্লাহ এর নামে মান্নত করে বলে, হে অমুক বুযুর্গ যদি আমার এই কাজ সফল হয় তবে আপনার নামে খানা তৈরী করব, আপনার কবরে গিলাফ লাগাবো, আপনার কবর পাকা করব। এগুলো প্রকাশ্য শিরক। —আগলাতুল আওয়াম : ১৪০

মান্নত এর মাসআলা সমূহ

মাসআলা : কোন কাজ সফল হওয়ার শর্তে কোন ইবাদতের মান্নত করার পর ঐ কাজ সফল হলে মান্নত পুরা করা ওয়াজিব। মান্নত পুরা না করলে কঠিন গুনাহ হবে। কিন্তু কোন ভ্রান্ত এবং শরীয়ত বিরোধী বিষয়ের মান্নত করলে তা পুরা করা ওয়াজিব নয়; বরং তা গুনাহ।

মাসআলা : কেউ যদি মান্নত করে যে, আমার অমুক কাজ হলে আমি পাঁচটি রোযা রাখব। কাজটি হয়ে গেলে তাকে পাঁচটি রোযা রাখতে হবে।

যদি এতটুকুই বলে যে, পাঁচটি রোযা রাখব, তাহলে লাগাতার পাঁচটি রোযা রাখতে পারে বা ভেঙ্গে ভেঙ্গেও রাখতে পারবে, কিন্তু মান্নত করার সময় যদি লাগাতার রাখব বলে কিংবা নিয়ত এভাবে থাকে তাহলে ধারাবাহিক পাঁচটি রোযা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে মাঝখানে দুই একটি ভাঙলে আবার নতুনভাবে পাঁচটি রোযা রাখতে হবে।

মাসআলা : কেউ যদি এক রাকাত নামায পড়ার মান্নত করে তবে তাকে দু'রাকাতই পূর্ণ আদায় করতে হবে। আর যদি তিন রাকাতের মান্নত করে তাহলে চার রাকাত পূর্ণ করতে হবে। এমনিভাবে পাঁচ রাকাতের মান্নত করলে ছয় রাকাত আদায় করতে হবে। এভাবে আরো বেশি সংখ্যার ক্ষেত্রে একই বিধান কার্যকর হবে।

মান্নত ব্যয়ের খাত

মাসআলা : মান্নতকৃত বস্তু শুধু গরীব ও অসহায়রাই খেতে পারে। যারা যাকাত গ্রহণ করতে পারে তাদের মাঝেই মান্নত বন্টন করতে হবে। বিত্তশালীদেরকে মান্নতের বস্তু দেয়া যাবে না। তদ্রূপ মান্নতকারী নিজে বা

নিজের পরিবারের সদস্যগণ, মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী উর্ধতন পুরুষগণ, পুত্র কন্যা এবং তাদের সন্তান সন্তুতি নিচের স্তর পর্যন্ত মান্নত খেতে পারবে না। এমনিভাবে স্বামী তার স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর মান্নত খেতে পারবে না।

মাসআলা : মান্নতের বস্তু পুরোটাই আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দেয়া জরুরী। চাই তা বকরী হোক বা অন্য কোন বস্তু।

মাসআলা : অনেকে ধনীদের মাঝে মান্নতকৃত বস্তু ব্যয় করে থাকে। এটাও ভুল পদ্ধতি। এর দ্বারা মান্নত আদায় হবে না।

–আগলাতুল আওয়াম : ১৪১

মাসআলা : কেউ মান্নত করল "যদি অমার অমুক আত্মীয় সুস্থ হয়ে যায় তবে আল্লাহর নামে একটি পশু যবাই করে আল্লাহর ওয়াস্তে দান করব। এই মান্নতের বস্তু যেটাই হোক তা মান্নতকারী, মান্নতকারীর মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী কেউই খেতে পারবে না। তদ্রূপ কোনো ধনী লোককেও তা দেয়া যাবে না। বরং পুরো মান্নতটাই গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। –ফাতাওয়া রশীদিয়া : ১/৫৪৮

মাসআলা : মৃত ব্যক্তির নামে মান্নত করা হারাম, ঐ মান্নত খাওয়া কারো জন্যই জায়েয নেই। তবে আল্লাহর নামে মান্নত করে তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য পৌছানো হলে মান্নত সহীহ হবে এবং গরীব লোকের উক্ত মান্নত খেতে পারবে। সম্পদশালী এবং পদস্থ ও সম্মানিত ওলামাদের জন্য এ জাতীয় খানা খাওয়া উচিত নয়। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/১২৪

সদকার ব্যয় খাত

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি সদকার নিয়তে একটি বকরী যবাই করে প্রতিবেশী ও পড়শীদের মাঝে বন্টন করে এবং নিজ ঘরেও তা ব্যবহার করে। সদকার বকরী নিজ ঘরে খাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : বকরী যবাই দ্বারা সদকা আদায় হয় না; বরং ফকীর মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দেয়ার দ্বারা সদকা আদায় হয়। অতএব যে পরিমাণ গোশত ফকীর মিসকীনদের মাঝে বন্টন করেছে ঐ পরিমাণের সদকা আদায় হয়েছে আর যেটুকু গোস্ত ঘরের জন্য রেখেছে ঐ অংশের

সদকা আদায় হয় নি। তবে যদি উক্ত বকরীটি মান্নতের হয়ে থাকে তাহলে পূর্ণ বকরী সদকা করা ওয়াজিব। বিত্তশালী প্রতিবেশীদেরকে দেয়া বৈধ হবে না, তদ্রূপ নিজেরাও তা খেতে পারবে না। –আপকে মাসায়েল : ৩/৪২৫

কুকুরকে সদকা দেয়া

প্রশ্ন : আমি সন্ধাবেলা আল্লাহর নামে কুকুরকে খাদ্যদ্রব্য, রুটি বা এক প্লেট চাউল দিয়ে থাকি, ফকীরকে দেইনা। কারণ বর্তমানে ফকীররা প্রতারণা করে। অর্থাৎ নকল ফকীর সেজে ভিক্ষা করে। কুকুরকে এভাবে খানা দেয়া সহীহ কি না?

উত্তর : মানুষ এবং কুকুরের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে, মানুষ এবং কুকুরকে প্রদত্ত সদকার মাঝে মানগত পার্থক্যও ঠিক সে পরিমাণই হবে। আপনি যে ধারণা পোষণ করেন যে, বর্তমান যুগের ফকীররা বানোয়াট ও প্রতারণা করে, এটা ভুল। আল্লাহ তা'আলার বহু বান্দাহ অভাবগ্রস্থ ও ক্ষুধাপীড়িত রয়েছেন, কিন্তু তাদের অভাবের কথা কারো সামনে প্রকাশ করে না। এ জাতীয় লোকদেরকে সদকা দেয়া অতি উত্তম। দ্বীনি মাদরাসার ছাত্ররা এবং আল্লাহর রাস্তার অনেক ক্ষেত্র আছে যে গুলো সদকা ব্যয়ের উত্তম খাত। এসব থেকে পাশ কাটিয়ে আপনার নিকট সদকার উপযুক্ত কুকুরই থেকে গেল! –আপকে মাসায়েল : ৩/৪২৮

(তবে হ্যাঁ কুকুর আল্লাহ তা'আলার মাখলুক হিসেব সামর্থ্য অনুযায়ী কুকুরকে খাবার দেয়াও সওয়াবের কাজ। কিন্তু তাই বলে সব ধরনের সদকার ব্যয় খাত কুকুর হতে পারে না। –অনুবাদক)

রোযার মান্নত করে ফিদইয়া দেয়া

প্রশ্ন : যায়দ মান্নত করে, যদি আমার ভাই সুস্থ হয়ে যায় তবে ৩০ দিন রোযা রাখব। এদিকে যায়দ একজন ব্যবসায়ী, এত রোযা রাখা তার জন্য কঠিন। সে কি উক্ত রোযাগুলোর পরিবর্তে ফিদইয়া দিতে পারবে?

উত্তর : যায়দ এর ভাই সুস্থ হয়ে গেলে যায়দকে ত্রিশ দিন রোযা রাখতে হবে। ধারাবাহিকভাবে এবং বিরতি দিয়ে উভয় ভাবেই রাখতে পারবে, এক্ষেত্রে ফিদইয়া দেয়া যথেষ্ট নয়। কারণ যে বস্তুর মান্নত করা হয় তা দেয়াই আবশ্যক। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৬/৭১

ফাতাওয়া আলমগীরী : ৩/৪২, হিদায়া : ১/৪৬৩

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করা

প্রশ্ন : কোন ওলী বা বুযূর্গ এর কবর যিয়াতের উদ্দেশ্যে যাওয়া, তাদের নিকট সাহায্য সহযোগিতা প্রার্থনা করা, এভাবে মান্নত করা যে, যদি এই কাজ হয়ে যায় তবে এত টাকা সদকা করব। এগুলো জায়েয কিনা?

উত্তর : বুযূর্গদের যিয়ারত জায়েয আছে। তবে তা হতে হবে সুন্নত তরিকায় (কবরের ওপর হাত রাখা, কবর স্পর্শ করা, চুমু খাওয়া, কবরে সিজদা করা ইত্যাদি বিষয় খ্রিস্টানদের অভ্যাস)। অলিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য করার ক্ষমতাই রাখে না। অতএব গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক। চাই তিনি ওলী হোন কিংবা নবী। আর 'আল্লাহ তা'আলা আমার এ কাজটা সফল করলে এত টাকা সদকা করব' এই মান্নত সহীহ আছে। পক্ষান্তরে যদি বলে, আমার এ কাজটা যদি হয়ে যায় তাহলে অমুক অলীর নামে দশ টাকা দেব। এই মান্নত হবে হারাম এবং অবৈধ। কেননা মান্নত হচ্ছে ইবাদত। আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তবে যদি এভাবে বলে যে, "আল্লাহ তা'আলা যদি আমার এ কাজটা সফল করেন তবে আল্লাহর নামে ১০ টাকার সাওয়াব অমুক বুযূর্গ এর রূহে পৌছাবো" তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ অবস্থায় গায়রুল্লাহর নামে মান্নত হয় না, বরং গায়রুল্লাহকে সাওয়াব পৌছানো হয়, মান্নত হয় আল্লাহর নামেই। –সহীহ বুখারী : ১/১৩১, ফাতাওয়া রশীদিয়া : ৫৫০

মাসআলা : অধিকাংশ সাধারণ মানুষের পক্ষ হতে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে যে সব মান্নত করা হয় এবং বুযুর্গদের সন্তুষ্ট করা এবং তাদের নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে তাদের মাযারে মোমবাতি, সুগন্ধি এবং টাকা পয়সা ও নযরানা পেশ করা ইমামগণের সকলের নিকটই বাতেল ও ভ্রান্ত। এগুলো নাজায়েয ও হারাম হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে– প্রথমত : এটা মাখলূকের জন্য কৃত মান্নত; অথচ মান্নত হলো ইবাদত যা একমাত্র আল্লাহর সাথেই বিশিষ্ট। দ্বিতীয়ত : মৃতের জন্য মান্নত করা হয় অথচ মৃত ব্যক্তি কোন বস্তুর মালিকই তো হতে পারে না। তৃতীয়ত : ঐ মৃত ওলীর

ব্যাপারে এই ভ্রান্ত আকিদা রাখার কারণে যে " তিনি দুনিয়াবী কাজে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা রাখেন", এই আকিদাও কুফরী ।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/২১৫

মন্দির বা কবরের মান্নত ও ভেঁট ক্রয় করা

মাসআলা : মোরগ, বকরী এবং অন্যান্য যে সব খাবার কাফেররা তাদের মন্দিরে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করে, মন্দির তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করার পর, ঐ খাদ্য ইত্যাদি ক্রয় করা যাবে। কেননা কাফের তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করার দ্বারা মালিক হয়ে যায়। কিন্তু অমুসলিমদের উপাসনালয় মন্দির ইত্যাদির কোন মুসলমান তত্ত্বাবধায়ক এগুলো গ্রহণ করলে তার মালিক হবে না বিধায় সেক্ষেত্রে তা ক্রয় করাও সহীহ্ হবে না। তবে ক্রেতা না জেনে ক্রয় করলে সমস্যা নেই। তার জন্য বৈধ হবে।

–ফাতাওয়া রশীদিয়া : ৪৯০

মাসআলা : গায়রুল্লাহ্ এর নামে মান্নতকৃত বকরী ইত্যাদি ক্রয় করা এবং গোশত খাওয়া কোনটিই জায়েয নয়। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৭/২৯৮

মাসআলা : অনেক মুর্খ লোকের ধারণা, কসম খাওয়ার সময় বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি মোচড়ালে কসম সংঘটিত হয় না; এটা ভুল।

–আগলাতুল আওয়াম : ১২৮

মাযারে জমা হওয়া তেলের বিধান

কবরের উপর বাতি জ্বালানো জায়েয নয়। তাই দরগাহ্ এর আলোকসজ্জার উদ্দেশ্যে যে তেল দেয়া হয়, তা মূল মাযার অংশে জ্বালানো যাবে না। তবে মাযার সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কামরা থাকলে, বা রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হলে সেখানে তেল জালানো যাবে। এমনিভাবে মাযার সংশ্লিষ্ট কোন মসজিদ থাকলে ঐ মসজিদেও ব্যবহার করা যাবে। ইমাম সাহেবের কামরাও যদি মাযার সংশ্লিষ্ট হয় সেখানেও ব্যবহার করা যাবে। মালিকের অনুমতি ব্যতীত এছাড়া অন্য কোন খাতে ব্যবহার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ তেল মাযারের জন্যই মান্নত করা হয়েছে তাহলে তা ব্যবহার করাই বৈধ নয়। কেননা গায়রুল্লাহর নামে মান্নত হারাম। এবং মান্নতকৃত বস্তু ব্যবহার করাও হারাম।

–ইমাদাদুল মুফতীন : ১ /১৮

মাসআলা : কবরের ওপর চাদর দেয়া নাজায়েয, তাই এর জন্য মান্নত করাও আরেকটি গুনাহ্। এ মান্নত সহীহ্ নয়। অতএব উদ্দেশ্য পূরা হলেও মান্নত পুরা করা জায়েয হবে না। হ্যাঁ আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় কল্পে সদকা করে দেয়া উত্তম। —ইমদাদুল মুফতীন : ১/১৯

কবরে বকরী যবাই করা

মাসআলা : যে প্রাণী গায়রুল্লাহ্ এর সম্মানে বা নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে যবাই করা হয়, যবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হলেও তা খাওয়া হালাল নয়। —ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৩/১২

সদকার মধ্যে বিশেষ কোন রঙ এর শর্ত করা

প্রশ্ন : সদকার মধ্যে কালো রঙ এর মোরগ দেয়া কিংবা বিশেষ কোন প্রজাতির মোরগ দেয়া জরুরী কিনা?

উত্তর : আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য যে বস্তুই আল্লাহর রাস্তায় দান করা হয় তা-ই সদকা। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী নফল সদকা করতে পারে। সদকার মাধ্যমে মুসিবত দূর হয়। সদকা হিসেবে মোরগ বা ছাগল যবাই করা শর্ত নয়। তদ্রূপ কোন নির্দিষ্ট রঙ বা প্রজাতির হওয়াও জরুরী নয়। যারা এসব শর্ত জুড়ে দেয়, তারা অধিকাংশই বদদ্বীন হয়ে থাকে।

—আপকে মাসায়েল : ৩/৪২৩

মাসআলা : উদ্দেশ্য সাধনের সাথে মিষ্টির মান্নত করলে উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হলেও মিষ্টি বিতরণ করা আবশ্যক নয়; বরং ঐ পরিমাণ টাকা কোন অভাবীকে দিয়ে দিবে। —আপকে মাসায়েল : ৩/৪২৪

গায়রুল্লার নামে ছেড়ে দেয়া ষাঁড়ের বিধান

মাসআলা : গায়রুল্লাহ্ এর নামে ছাড়া প্রাণী হারাম। এগুলো খাওয়া জায়েয নয়। তবে এ জাতীয় ষাঁড়ের প্রজননে গাভী গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা দিলে ঐ বাচ্চা হারাম হবে না। —ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৭/২৯১

মাসআলা : গায়রুল্লাহ্ এর নামে যা কিছু উৎসর্গ করা হয়, তার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় বুযূর্গদের রূহে ঈসালে সাওয়াব করা, অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে সদকা করা হয়েছে তার সাওয়াব কোন বুযূর্গের জন্য

পৌঁছানো উদ্দেশ্য হলে উক্ত পদ্ধতি বৈধ। পক্ষান্তরে ঐ বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি তার নামেই মান্নত ও উৎসর্গ করা হয় এবং এই আশা পোষণ করা হয় যে, বুযূর্গব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের কাজ করে দিবেন। এটা নাজায়েয এবং শিরক। —আপকে মাসায়েল : ৩/৪২০

মান্নত পূরা করা ওয়াজিব

প্রশ্ন : আমার মা অসুস্থ ছিলেন, আমি মান্নত করেছিলাম, যদি মায়ের অপারেশন কৃতকার্য হয় আমি একশত রাকাত নফল নামায পড়ব। মা সুস্থ হওয়ার পর আমি শুধু ১৮ রাকাত পড়েছি। অবশিষ্ট গুলো আদায় করিনি; এখন কী করণীয়?

উত্তর : আপনার মায়ের অপারেশন যদি সফল হয়ে থাকে তবে আপনার ওপর একশত রাকাত নামায ওয়াজিব হয়ে গেছে। আপনার মান্নত পুরা করা ওয়াজিব। তাই অবশিষ্ট নামাযগুলো আদায় করে নিন।
—আপকে মাসায়েল : ৩/৪২৭

মাসআলা : মান্নতকারী যদি কত রাকাত নফল নামাযের মান্নত করেছে সে সংখ্যা ভুলে গেলে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে একটা সংখ্যা নির্ধারণ করে আদায় করতে থাকবে। এক্ষেত্রে নফল নামাযই আদায় করতে হবে; সদকা করা যথেষ্ট হবে না। —আপকে মাসায়েল : ৩/৪২৭

মাসআলা : যে কাজের জন্য আপনি মান্নত করেছেন ওই কাজটি সম্পূর্ণ না হলে মান্নত আবশ্যক হয় না। আপনি যদি বলে থাকেন, এতটি রোযা রাখব বা এত টাকা সদকা করব। তবে কাজ হওয়ার পর আপনাকে ঐ পরিমাণ রোযা ও সদকা আদায় করতে হবে। যদি রোযার সংখ্যা বা সদকার পরিমাণ স্মরণ না থাকে তাহলে চিন্তা ভাবনা করে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে যে পরিমাণ স্থির হয় তা আদায় করতে হবে। আর যদি এভাবে বলে থাকেন যে, কিছু রোযা রাখব ও কিছু সদকা করব তবে তার পরিমাণ এখন নির্ধারণ করতে হবে। —আপকে মাসায়েল : ২/৪২৩

সদকার আমানত হারিয়ে গেলে

প্রশ্ন : আমার বোন একটা ছাগল সদকা করার জন্য আমার নিকট চারশত টাকা দেয়। ঘটনাক্রমে উক্ত টাকা আমার পকেট থেকে কোথাও হারিয়ে যায়। এ অবস্থায় বোনের সদকা আদায় হয়েছে কিনা?

উত্তর : উক্ত টাকা আদায় করে দেয়া আপনার উপর ওয়াজিব নয়। আর আপনার বোন যদি নফল সদকার জন্য টাকা দিয়ে থাকে তাহলে তার উপরও কিছু আবশ্যক হবে না। কিন্তু মান্নতের সদকার জন্য টাকা দিয়ে থাকলে তার মান্নত অবশ্যই পুরা করতে হবে। –আপকে মাসায়েল : ৩/৪২৪

কুসংস্কার

মাসআলা : দুনিয়াতে আসার শুরু লগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত প্রকার কুসংস্কার করা হয় তার অধিকাংশই এমন কি পুরোটাই বড় বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের মাঝে প্রবল বেগে বিস্তৃতি লাভ করে। এসবের ব্যাপারে মানুষের ধারণা হয় যে, এতে গুনাহ হবে কেন? কোন নাচ গান নেই, বাদ্য বাজানো হয় না, তারপরও এটা কেন শরীয়ত বিরোধী হবে যা থেকে মানুষদেরকে বারণ করতে হবে?

এই ভুল ধারণার একমাত্র কারণ হচ্ছে, এসব কুসংস্কার সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করার কারণে বিবেকের ওপর পর্দা পড়ে গেছে, তাই এগুলোর মধ্যে যেসব খারাপ বিষয় এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ত্রুটি নিহিত রয়েছে সে পর্যন্ত পৌঁছার মত শক্তি ও বিবেক হারিয়ে বসেছে। যেমন : কোন অবুঝ শিশু মিষ্টির স্বাদ এবং রঙ দেখে মনে করে যে, এটা খুব ভালো বস্তু। কিন্তু এটা খাওয়ার পর যে সব ক্ষতি হবে সে সম্পর্কে সে একেবারেই অজ্ঞ । তার মা-বাবাই এ বিষয়ে ভাল জানে বিধায় তারা সন্ত ানকে মিষ্টি খেতে বারণ করে, আর এতেই সে তার কল্যাণকামী মা-বাবাকে শত্রু মনে করে। বাস্তবে এসব কুসংস্কারের মধ্যে যে সব ত্রুটি ও ক্ষতি রয়েছে তা খুব বেশি সূক্ষ্ম বা গোপনও নয়, বরং সকলেই এসব কুসংস্কারের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে পেরেশান এবং উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে নিপতিত। সকলেই চাচ্ছে, যদি এসব বদরসম না থাকত তবে কতইনা ভাল হত! কিন্তু এ সব কুপ্রথা বিস্তৃত হয়ে যাওয়ায় সবাই স্বানন্দচিত্তে করে যাচ্ছে, এগুলোকে একসাথে ছেড়ে দেয়ার মত সাহস তাদের হচ্ছে না। এর বিপরীত বুঝানো হলে তারা উল্টা অসন্তুষ্ট হয়ে বসে।

মুসলমান নারী-পুরুষ সকলের উচিত এসব অহেতুক কুসংস্কারকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা এবং সমাজে যাতে একটি কুসংস্কারও অবশিষ্ট না থাকে সে জন্য হিম্মতের সাথে প্রাণপন চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেভাবে মানুষের জীবন যাত্রা অতি সাদা সিধা, অনাড়ম্বর ও নিষ্কলুষ ছিল, বর্তমান সমাজব্যবস্থাও যেন সেরকম হয়ে যায় এর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এর জন্য যারাই চেষ্টা করবে তাদের অনেক সওয়াব হবে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "কোন সুন্নত (পদ্ধতি) বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি তার প্রচলন ঘটাবে এবং জীবিত রাখবে, সে একশ শহীদের সওয়াব লাভ করবে।"

স্মরণ রাখবে, যাবতীয় কুসংস্কার তোমাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট, তাই তোমাদের সামান্য প্রচেষ্টা অনেক ক্রিয়াশীল হবে। ইনশা আল্লাহ।

–বেহেস্তী যিওয়ার : ৬/৭

বৈবাহিক ভোজ দেয়া

প্রশ্ন : ভাগ্নের বিবাহে মামা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যে বৈবাহিক ভোজ দিয়ে থাকে তা জায়েয কিনা?

উত্তর : ভাগ্নে, ভাগ্নিদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু হিন্দুস্তানে যেভাবে বৈবাহিক ভোজ দেয়ার কুসংস্কার প্রচলিত তা হিন্দুয়ানী পদ্ধতি এবং প্রদর্শনী মাত্র। আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার যে মৌলিক উদ্দেশ্য; তা এক্ষেত্রে মোটেও চিন্তা করা হয় না বরং নাম ফুটানো, লৌকিকতা প্রদর্শন এবং ভৎসনা ও নিন্দা হতে বাঁচার জন্য এগুলো দেওয়া হয়। কারো সামর্থ্য না থাকলে ঋণ করে হলেও তা দিতে বাধ্য হয়। এটা মোটেও সহীহ নয়। তবে উপরোক্ত খারাপ উদ্দেশ্যাবলী না থাকলে এবং তা শুধু আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার্থে হলেও ব্যাপক প্রচলিত কুসংস্কার হওয়ার কারণে এভাবে না দেয়া চাই; বরং বিবাহের বেশ পূর্বে কিংবা প্রয়োজনবোধে কোন ধরনের লৌকিকতা না করে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ চুপিসারে দেয়া যেতে পারে। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/২৪৩

মাসআলা : দুই ঈদের মধ্যবর্তী সময়ে বিবাহ করা যায়না আর এ সময় বিবাহ হলে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বনি বনা হয়না মর্মে যে কথা সাধারণ্যে প্রচলিত রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল, মনগড়া ও বানোয়াট। হযরত আয়েশা রাযি.-এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ হয়েছে শাওয়াল মাসেই। –আগলাতুল আওয়াম : ১৬২

বিবাহের সময় কালিমা পড়া

মাসআলা : বিবাহের সময় বরকে কালিমা পড়ানো জরুরী নয়। কালিমা পড়ানো ছাড়াই বিবাহ সহীহ হয়ে যায়। কেননা সে-তো পূর্ব থেকেই মুসলমান। কোন মুসলমানকে বিবাহের সময় কালিমা পড়ানো শরঈ দৃষ্টিতে আবশ্যক নয়, তবে পড়ালেও সমস্যা নেই।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৫/১৩১

মাসআলা : বিয়ের জন্য মানুষ বিশেষ তারিখ নির্ধারণ করে থাকে অনেকে মনে করে মাসের ৩, ১৩ ও ২৩ তারিখ না হওয়া ভাল। উক্ত তিন তারিখ ব্যতীত অন্য যেকোন তারিখে বিয়ে হতে পারে। এই কু প্রথা ভিত্তিহীন। উক্ত তারিখ পালন করা আবশ্যক নয়।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১২/১৯১

মাসআলা : মেহেন্দী উৎসব যে সব আনুসাঙ্গিক বিষয়ের সাথে পালন করা হয় তা জাহেলী যুগের কুপ্রথা ও স্মারক। বাহ্যত খুব নির্ভেজাল ও ত্রুটিমুক্ত মনে হলেও বাস্তবে তা বেশ কতগুলো হারাম বিষয়ের সমষ্টি স্থল। তাই এ প্রথা বন্ধ করে দেয়া আবশ্যক। মূলতঃ মেয়েদের মেহেদী লাগানো কোন খারাপ কাজ নয়, কিন্তু এর জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা, মেহমান দাওয়াত করা, অশ্লীল পোশাক পরে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা করা একেবারেই লজ্জাহীনতা, দৃষ্টিকটু এবং শরীয়ত গর্হিত কাজ। –আপকে মাসায়েল : ৮/১৩২

মাসআলা : বিবাহ অনুষ্ঠানে বর কনেদের টোপর পরানো হিন্দু সংস্কৃতি। হিন্দুস্তানের অজ্ঞ ও আমলহীন মুসলিম পরিবারগুলো হিন্দুদের সাথে উঠা বসার কারণে তাদের মাঝে এ কুসংস্কৃতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে, যা পরিহার করা একান্ত জরুরী। হিন্দুস্তানের আকাবের আলেম হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব রহ., মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. প্রমূখ من تشبه بقوم فهو منهم এ হাদীসের ভিত্তিতে উক্ত কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/১৫৫, ২/১৯৭

সিঁদুর ও মেহেন্দী লাগানো

মাসআলা : মহিলাদের সিতায় সিঁদুর লাগানো হিন্দু সংস্কৃতি। মুসলমান নারীদের জন্য তা বর্জন করা জরুরী। মহিলাদের জন্য মেহেন্দী ব্যবহারের অনুমতি আছে। এমনকি হাতে পায়ে মেহেন্দী ব্যবহার করা নারীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই পুরুষদের জন্য নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা বৈধ নয়। হাদীস শরীফে এসেছে–

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء

অর্থাৎ, নারীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/১৫৫

জন্ম বার্ষিকী পালন করা

মাসআলা : জন্ম বার্ষিকী পালন করা বিজাতীদের সভ্যতা। বাচ্চার জন্ম তারিখে কেক কাটা এবং বাচ্চার বয়স অনুযায়ী মোতবাতি জ্বালানো অর্থাৎ যত বছর বয়স ততটা মোমবাতি জালানো নিকৃষ্ট কুসংস্কার এগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। অন্যথায় ঈমানের ঝুঁকি রয়েছে।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৭/৭৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৭/৩৬০, আপকে মাসায়েল : ৮/১২৭

মাসআলা : চল্লিশ দিনের বাচ্চাকে মসজিদে নিয়ে সিজদা করানোর প্রচলিত সংস্কৃতিও ভিত্তিহীন। এটি পরিত্যাগযোগ্য।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১০/৮২

মাসআলা : আত্মীয় স্বজনদের পক্ষ থেকে জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হলে উক্ত দাওয়াতে অংশগ্রহণ না করা চাই। কারণ অনর্থক ও ভিত্তিহীন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করাও অনর্থক কাজ।

মাসআলা : উপহার উপঢৌকন দেয়া ভাল। কিন্তু জন্ম বার্ষিকতে উপঢৌকন দেয়া বিদআত। –আপকে মাসায়েল : ৮/১২৭

মাসআলা : জন্মবার্ষিকী পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত হওয়া শরীয়ত বিরোধী কাজ। –ফাতাওয়া রশীদিয়া

মাসআলা : ইংরেজী নববর্ষের আগমন উপলক্ষে আনন্দ উৎসব করা খ্রিষ্টানদের সংস্কৃতি। মূর্খতার কারণে মুসলমানরাও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

–আপকে মাসায়েল : ৮/১২৯

নবজাতককে উপহার দেয়া

মাসআলা : নবজাতকের জন্মের পর তাকে হাদিয়া দেয়া বড়দের পক্ষ থেকে বিশেষ স্নেহের বহি:প্রকাশ। কিন্তু এটাকে জরুরী ও ফরয ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত মনে করা এবং হাদিয়া প্রাপ্তিকে বাচ্চার নেককার হওয়ার নিদর্শন মনে করা ভুল এবং মূর্খতাসূলভ চিন্তা বৈ কিছুই নয়।

–আপকে মাসায়েল : ৮/১৪১

সবক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে সবক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। এটা জায়েয আছে কিনা? উক্ত অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হলে তা কবুল করা যাবে কিনা?

উত্তর : কোন বুযূর্গ ও নেককার ব্যক্তি দ্বারা সবক উদ্বোধন করে বাচ্চার পড়াশুনার মধ্যে বরকত লাভের আশায় কিছু গরীব এবং ঘনিষ্ঠজনদেরকে খানা খাওয়ানো যেতে পারে। তবে লৌকিকতা ও দাম্ভিকতা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৭/৪৬২

মাসআলা : বর্তমানে ৪ বছর বয়সে বাচ্চার সবক উদ্বোধনের সময় নির্ধারণ করার প্রচলন রয়েছে। কুরআন হাদীসের কোথাও ৪ বছরের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। –আগলাতুল আওয়াম : ৮১

মাসআলা : অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চার মুখে কথা ফুটলেই আব্বা, আম্মা, দাদা ইত্যাদি শিখানো হয়। এসবের পরিবর্তে যদি আল্লাহ! আল্লাহ! শিখানো হতো তা কতইনা উত্তম হতো। –বেহেস্তী যিওয়ার : ৬/১৬

ঈদ মোবারক বলা

প্রশ্ন :আজকাল ঈদের দিন বিশেষ করে ঈদের নামাযের পর 'ঈদ মোবারক' বলার ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে। শরীয়তে এ প্রথার কোন প্রমাণ আছে কিনা?

উত্তর : শরীয়তে এর কোন প্রমাণ নেই। আর সাধারণ মানুষ এটাকে জরুরী মনে করে বিধায় তা মাকরূহ। তদ্রূপ যদি এটাকে সাওয়াবের কাজ মনে করা হয় তাহলে তা বিদআতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে মারাত্মক গুনাহ হবে।

১. হযরত ফুকাহায়ে কেরাম ঈদের দিনের সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'ঈদ মোবারক' বলা যদি সুন্নত হত, তাঁরা অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন।

২. এটা বলা যদি মুস্তাহাব হতো তাহলে উম্মতের আলেম ওলামা, নেককার বুযুর্গগণের যুগ পরম্পরায় আমল চলে আসত। কিন্তু এমনটি পাওয়া যায় না বরং এটি আম জনসাধারণের আবিস্কৃত একটি কুসংস্কার।

৩. সাধারণভাবে বরকতের দুআ করা মুস্তাহাব। তবে বিশেষ শব্দকে দু'আর জন্য জুরুরী মনে করা বিদআত। অতএব ঈদের দিন দু'আর উদ্দেশ্যে কোন বাক্য বলা যেমন-আল্লাহ তা'আলা ঈদের বরকত দান করুন, বরকতপূর্ণ করুন ইত্যাদি বলা যেতে পারে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে 'ঈদ মোবারক' ব্যবহার করা এ বাক্যটিই মূল উদ্দেশ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তাই দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জিত হওয়ার কারণে তা মাকরূহ এবং বিদআত।

—আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৮৪

ঈদ বখশিশ চাওয়া

মাসআলা : বড়দের থেকে জোরপূর্বক ঈদ বখশিশ উসূল করা জায়েয নেই। তবে সানন্দে ও সন্তুষ্টচিত্তে অধিনস্ত চাকর চাকরানী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্ত্রী ও কন্যাদেরকে বখশিশ দেয়া উত্তম। কিন্তু এটাকে জরুরী ও আবশ্যক বা সুন্নত মনে করা যাবে না। —আপকে মাসায়েল : ৮/১২৬

পোষাক পরিধানের কুসংস্কার

মাসআলা : পাগড়ী বাধার জন্য অনেককে বসে যেতে আবার অনেককে দাঁড়াতে দেখা যায়, এর কোন ভিত্তি নেই।

গদ্দিনশীন বানানোর প্রথা

মাসআলা : কোন পীরের ইন্তেকাল হয়ে গেলে তার মুরীদরা একত্রিত হয়ে, পীরের কোন পুত্র বা খাদেমকে গদ্দিনশীল বানিয়ে দেয়। এর প্রমাণ হিসেবে পাগড়ী পরিয়ে দেয়। ছেলের মধ্যে যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, যে সব লোক তাসাওউফ এর রাস্তা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও অপরিচিত তাদের অনুমতি কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে? বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে। যারা এরূপ প্রথাগত গদ্দিনশীনদের হাতে বায়আত হয় তাদের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার গুনাহ ঐ গদ্দিনশীন ভন্ড পীরের পাশাপাশি যারা তাকে নির্বাচিত

করেছে সকলের ওপরই বর্তাবে। কিয়ামতের পূর্বে মানুষ মূর্খদেরকে নিজেদের নেতা বানাবে, হাদীস শরীফে এর ভবিষ্যদ্বানী উচ্চারিত হয়েছে।

–বুখারী শরীফ, ইলম অধ্যায় :১০০,
ইসলাহুররুসূম : ১৪০

হাজী সাহেবদের দাওয়াত করা এবং হাদিয়া আদান প্রদান

মাসআলা : এ জাতীয় প্রথা প্রচলিত থাকলে রহমতের স্থলে তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নিয়ামত হয়ে যাবে শাস্তি। কতইনা খারাপ ঐ সব প্রথা যা রহমতকে শাস্তিতে রূপান্তর করে দেয়। এসব প্রথা অপচয় ও অপব্যয় ব্যতীত কিছুই নয়। তাই এগুলো অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এসব বর্জনের মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত, সহজ হবে জীবন যাপন। প্রথাগত এসব লেনদেনের প্রচলন না থাকলে পরস্পরের সাক্ষাত হবে আন্তরিকতা ও ইখলাসপূর্ণ অথচ এসব প্রথাগত হাদিয়া তোহফা ইত্যাদির কারণে পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ এবং দু'আ প্রার্থনা অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিতও হতে হয়। সর্বোপরি এসব প্রথার পেছনে রয়েছে অনেক কষ্ট এবং শরীয়ত বিরোধী অনুষঙ্গ।

যেসব সৌভাগ্যবানকে আল্লাহ তা'আলা হজের তাওফীক দান করেছেন তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে আত্মীয় স্বজন এবং ভক্তবৃন্দকে জানিয়ে দিবেন যে, প্রথাগত এসব হাদিয়া তোহফা আদান প্রদানের চিন্তাও করা যাবে না। যারা এসব প্রথা দূর করবে ইনশাআল্লাহ তারা বিশেষ প্রতিদান লাভ করবে। ভবিষ্যতে যারাই এর উপর আমল করবে সকলেই সওয়াব লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/১৮৩, মিশকাত শরীফ : ২৩৩

মৃতব্যক্তির ঘরে ঈদের দিন খানা পাঠানো

মাসআলা : ঈদের দিন মৃত ব্যক্তির ঘরে খানা পাঠানো ভুল প্রথা। তা অবশ্যই বর্জনীয়। মৃত্যুরপর একদিন মৃতের ঘরে খানা পাঠানো সুন্নত। এরপর বিশেষ করে ঈদের দিন খানা পাঠানো সহীহ নয়। এটি ইসলামী পদ্ধতি নয়;[৮] বিজাতীয় সংস্কৃতি। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৬/২৭৩

আকীকার মধ্যে প্রচলিত প্রথা সমূহ

আকীকার পদ্ধতি

মাসআলা : সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর সপ্তম দিনে বাচ্চার নাম রেখে আকীকা করবে। আকীকার মাধ্যমে বাচ্চার ওপর থেকে বিপদাপদ দূর হয় এবং মুসীবত থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

মাসআলা : ছেলের জন্য দু'টা বকরী বা ভেড়া আর মেয়ের জন্য একটা বকরী বা ভেড়া কিংবা বড় পশুগুলোতে ছেলের জন্য **দুই অংশ** এবং মেয়ের জন্য এক অংশ দ্বারা আকীকা করা যাবে। আকীকার পাশাপাশি বাচ্চার মাথা মুন্ডিয়ে চুলের সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রূপা সদকা করে দেওয়া উত্তম। মনে চাইলে বাচ্চার মাথায় জাফরানও লাগানো যাবে

–জামে তিরমীযি : ১৫১৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ২৬/৪১৬
ইসলামে আওলাদ কী তরবিয়াত : ৩২

মাসআলা : কারো অস্বচ্ছলতার কারণে ছেলের জন্য যদি একটি বকরী বা বড় পশুর এক অংশ দ্বারা আকীকা করে তাহলেও কোন সমস্যা নেই। তদ্রূপ বাচ্চার আকীকা না করলেও কোনো সমস্যা নেই।

–আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫৩৫ (জাকারিয়া বুক ডিপো)

মাসআলা : সপ্তম দিনে আকীকা না করে থাকলে পরবর্তীতে যখনই আকীকা করবে সপ্তম দিনের হিসাবেই করবে। আর এ হিসাব এ ভাবেই সহজ হবে বাচ্চা যে দিবসে জন্মগ্রহণ করেছে তার একদিন পূর্বে আকীকা করবে। যেমন বাচ্চা শুক্রবার জন্মগ্রহণ করলে বৃহস্পতিবার আকীকা করবে। বৃহস্পতিবারে জন্মগ্রহণ করলে বুধবার আকীকা করবে।

মাসআলা : অনেক স্থানে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, বাচ্চার মাথায় খুর ইত্যাদি চালানো আরম্ভ করা মাত্রই আকীকার পশু যবাই করে দেয়। এটি অর্থহীন, একটি কুপ্রথা। বাচ্চার চুল কাটার আগে পরে যখন খুশি তখনই পশু যবাই করার অনুমতি ও স্বাধীনতা শরীয়তে রয়েছে।

মাসআলা : যে পশুর কুরবানী জায়েয নেই ঐ পশুর আকীকাও জায়েয নেই। যে পশুর কুরবানী জায়েয, তার আকীকাও জায়েয।

মাসআলা : আকীকার গোশতের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা আছে যে, ইচ্ছা করলে কাচা গোশত বন্টন করতে পারে বা রান্না করে দাওয়াত করেও খাওয়াতে পারে।

মাসআলা : আকীকার গোশত মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী সকলেই খেতে পারে। —বেহেস্তী যিওয়ার : ৩/৪৩

খতনার কুপ্রথা

খতনা উপলক্ষেও মানুষ বেশ কিছু কুপ্রথার আবিস্কার করেছে, যা একেবারেই বিবেক বিরোধী ও অনর্থক কাজ। যেমনঃ দাওয়াত কার্ড পাঠিয়ে লোকজনকে আমন্ত্রণ করা। এটি সুন্নত বিরোধী পদ্ধতি। একবার খতনার অনুষ্ঠানে জনৈক সাহাবীকে আমন্ত্রন করা হলে ঐ সাহাবী দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় খতনা অনুষ্ঠানে আমরা কেউ যেতাম না, আর আমাদের কাউকে আমন্ত্রণও জানানো হতনা।

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে বিষয়ের প্রচার করা জরুরী নয় তার জন্য লোকজনকে দাওয়াত করা এবং এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা সুন্নত বিরোধী কাজ। এছাড়া এ উপলক্ষে যে সব কুপ্রথা অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলো রোধে দীর্ঘ সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা জরুরী। যেমন অনেককে দেখা যায় বাচ্চা বড় হয়ে যাওয়ার পর খতনা এত বিলম্বে করে এদিকে উপস্থিত সকলেই তার সতর দেখে, অথচ খতনাকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য তার সতর দেখা হারাম। বাচ্চাকে বিলম্বে খতনা করানো এবং লোকজনকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণেই এই গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি হচ্ছে বাচ্চা খতনাযোগ্য হওয়া মাত্রই কোন খতনাকারীকে ডেকে চুপিসারে খতনা সেরে নেয়া। এটাই নিরাপদ পদ্ধতি। —বেহেস্তী যিওয়ার : ৬/১৫

মাসআলা : খতনা উপলক্ষে লোকজনকে দাওয়াত দেয়া স্বতন্ত্র এক বিদআত। হযরত ওসমান ইবনুল আস রাযি.-কে কেউ খতনার অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিলে তিনি সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা কখনোই খতনা অনুষ্ঠানে যেতাম না।" আর দাওয়াত না করা হলে খতনা পূর্ণতা লাভ করে না মর্মে ধারণা রাখা আরেকটি ভিন্ন গুনাহ। —ইমদাদুল মুফতীন : ১/২১

মাসআলা : খতনা করার জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। বাচ্চার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন বয়সেই করা যাবে। তবে সামর্থ্য না হলে বালেগ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা যাবে। —রফাহুল মুসলিমীন : ২১

মাসআলা : যে সব পরিবার বিবাহশাদী কিংবা খতনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার কুপ্রথা ও বিদআতে জড়িয়ে পড়ে তাদের এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা মোটেও ঠিক নয়। বাড়িতে খানা পাঠিয়ে দিলে তা গ্রহণ না করলে যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে তাহলে গ্রহণ করবে না, ফিতনার আশঙ্কা হলে ফিতনা দূর করার লক্ষ্যে তা গ্রহণ করা চাই।

–ফাতাওয়া রশীদিয়া : ১৬৩।

মাসআলা : খতনা ইত্যাদির অনুষ্ঠানে প্রথা হিসেবে মসজিদে কিছু দেয়া হলে তা গ্রহণ করা যাবে না। তবে সন্তুষ্টচিত্তে ইমাম ও মুআযযিন সাহেবকে কিছু হাদিয়া দিলে তাতে অসুবিধা নেই। যাকে দেয়া হবে তিনি তার মালিক হবেন, মসজিদের জন্য কিছু দিলে মসজিদই মালিক হবে।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৫/৪০১

মাসআলা : বিবাহ ও খতনা অনুষ্ঠানে আনন্দ উপলক্ষে শরীয়তের গন্ডিতে থেকে ছেলেদেরকে উন্নতমানের কাপড় পরিধান করানো জায়েয আছে। তবে বরের গলায় মালা দেয়া বা টোপর পরা পরা যাবে না। এমনিভাবে ফটকাবাজিতেও লিপ্ত হবে না। এটি হিন্দুদের অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতি। এ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৭/৪৬৩

মাসআলা : খতনা না করা হলে বিবাহ সহীহ হয় না, কথাটি সঠিক নয়। এটি মূর্খদের প্রচলিত কথা। খতনা ছাড়াও বিবাহ শুদ্ধ হয়।

–ফাতাওয়া দারুল উলূম : ১/১৯

কুরআন শরীফ নিচে পড়ে গেলে

মাসআলা : কুরআন শরীফের সাথে কোনরূপ বে-আদবী হলে (নিচে পড়ে গেল) কুরআন শরীফের ওযন পরিমাণ শস্য সদকা করার প্রচলন রয়েছে আর বাহ্যত এর উদ্দেশ্য ভালো এবং সঙ্গত মনে হয় এ কারণে যে, এর কাফফারা স্বরুপ সদকা আদায় করে দেয়া হয়। পাশাপাশি এর ফলে নিজের মধ্যে সচেতনতা ও সতকর্তা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর দু'টি বিষয় সংশোধনযোগ্য।

প্রথমত : কুরআন শরীফকে শস্যের সাথে পাল্লায় উঠিয়ে পরিমাপ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত: এটাকে শরঈ ওয়াজিব মনে করা যাবে না। তবে যদি

উক্ত কল্যাণের দিক বিবেচনায় রেখে আনুমানিকভাবে কিছু শস্য ইত্যাদি সদকা করে দেয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। –আগলাতুল আওয়াম : ৭৫

মাসআলা : অনেক মূর্খলোক একই দিনে জুমআ ও ঈদ হওয়াকে বরকতপূর্ণ নয় বলে মনে করে, এটি একেবারেই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন কথা। বরং এর মধ্যে দু'টি বরকত একত্রিত হয়ে যায়। –আগলাতুল আওয়াম : ১৮৮

খানার পরে দু'আ পড়ার সময় হাত উঠানো

মাসআলা : প্রত্যেক মাসনূন ও মুস্তাহাব দু'আর সময় হাত উঠানো জরুরী নয়। যেমন : খানা খাওয়ার পর দু'আর সময়, তাওয়াফের সময়ের দু'আ, নামাযের ভিতরের দু'আ, মসজিদে প্রবেশের সময় এবং বের হওয়ার সময় দু'আ, স্ত্রী সহবাসের সময়, বাথরুমে প্রবেশ করা এবং বের হওয়া উভয় সময়ে দু'আ পড়া হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে হাত উঠিয়ে দু'আ করা কোথাও প্রমাণিত নেই। সুতরাং খানার পর দু'আর সময় হাত উঠানো মাসনূন নয়। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪৫৪
মারাকিল ফালাহ : ১৮৫, আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৬৬

ঋতুবর্তী নারীর হাতের কিছু খাওয়া

মাসআলা : গোসল করার পূর্বে প্রসূতির হাতে কিছু খাওয়া সহীহ নয় মর্মে যে কথা সমাজে প্রচলিত রয়েছে তা ভুল। মাসিক এবং সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর যে রক্ত আসে ওই রক্তের কারণে মহিলার হাত নাপাক হয় না।

মাসআলা : অনেক সাধারণ মানুষ মনে করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্বামীর জন্য আতুর ঘরে (বাচ্চা প্রসবের স্থান) না যাওয়া উচিত। এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা : অনেক মহিলা নেফাস থেকে ৪০ দিনের পূর্বেই পবিত্র হলেও চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয মনে করে না। এটি স্পষ্ট দ্বীন বিরোধী কথা। নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে ৪০ দিন, সর্বনিম্ন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। সুতরাং যখনই পবিত্র হবে তখনই নামায আরম্ভ করতে হবে।

মাসআলা : এমনিভাবে ৪০ দিনের পরও যদি রক্ত বন্ধ না হয় তাহলে নিজেকে পবিত্র হিসেবে ধরে অবশ্যই নামায আরম্ভ করতে হবে।
–আগলাতুল আওয়াম : ৪৬

মাসআলা : চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত রক্ত ইস্তেহাযা বা রোগজনিত রক্ত হিসেবে তখন পবিত্রতার বিধান কার্যকর হবে। –ফাতাওয়া শামী : ১/৪৯৮

দুআয়ে গনজুল আরশ

প্রশ্ন : ১. দরূদে গনজুল আরশ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না?

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এ দু'আ পড়েছেন কিনা? অথবা কোন সাহাবীকে এ দু'আ শিখিয়েছেন কিনা?

৩. এটি যদি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না হয়ে থাকে তবে যুগ যুগ ধরে যারা এর ওপর আমল করে আসছে তারা এর সওয়াব পাবে কি না? বিস্তারিত জবাব দিয়ে মেহেরবানী করবেন।

উত্তর : (১, ২, ও ৩) উল্লেখিত দু'আ সমূহের বর্ণনা জাল ও ভিত্তিহীন ভাবে লেখা হয়েছে। কোন নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস এ বর্ণনা গুলোকে সত্যায়ন করেন নি। সুতরাং এ দু'আগুলোকে প্রামাণিক মনে করা এবং এগুলোর জন্য বর্ণিত ফযীলতকে সহীহ মনে করে পড়া একেবারেই ভুল। বরং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, হাদীসে বর্ণিত দু'আ সমূহ, যিকির আযকার, দরূদ শরীফ, ১, ২ ও ৩ নং কালেমা শরীফ, ইস্তেগফার, হিসনে হাসীন, হিযবুল আযম, মুনাজাতে মকবূল ও ওলামায়ে কেরামের আমলযোগ্য অন্যান্য (কিতাব সমূহ) আমলের ওপর যথেষ্ট মনে করার মধ্যে কল্যাণ, বরকত ও হেদায়াত রয়েছে।

পাঞ্জে সূরা নামক কিতাবে দু'আয়ে কদহ সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃত বর্ণনাটিও জাল। একে প্রামাণিক এবং সহীহ মনে করা যাবে না। এবং এ অনুযায়ী আমলও করা যাবে না।

কুরআনে কারীম আল্লাহ তা'আলার কালাম। ঈমানদারদের জন্য এটি অনেক বড় নেয়ামত। কুরআনে কারীম তিলাওয়াত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মহান মাধ্যম। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের বহু ফযীলত ও সাওয়াবের কথা বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অথচ কুরআন মাজীদ পড়া, বুঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্য মানুষ চেষ্টা না করে ভিত্তিহীন এবং প্রমাণহীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই বিশেষ মনোযোগের সাথে আগ্রহ নিয়ে বেশি বেশি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত

করতে হবে, পাশাপাশি আল্লাহর যিকির, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কালেমা, ইস্তেগফার, দরূদ শরীফ এবং নির্ভরযোগ্য দু'আসমূহ পড়তে থাকতে হবে। ফাতাওয়া মাহমূদিয়া উদ্ধৃত হয়েছে–

প্রশ্ন : নূরনামা আহদনামা, দু'আ গনজুল আরশ, দরূদে তাজ, দরূদে লাক্ষীর কোনো প্রমাণ আছে কিনা? এগুলোর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা ঠিক আছে নাকি অতিরঞ্জন? এছাড়া এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, নাকি লোকেরা নিজে নিজেই সংকলন করে দিয়েছে? এগুলো পাঠ করার বিধান কী?

উত্তর :এগুলোর কোন সহীহ প্রমাণিক ভিত্তি নেই। এগুলোর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। তাই এগুলোর পরিবর্তে কুরআন শরীফের তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ, কালেমা শরীফ এবং বেশি বেশি ইস্তেগফার করা চাই।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪৯৪

সম্মিলিতভাবে খতমে খাজেগান পড়া

প্রশ্ন : সম্মিলিতভাবে খতমে খাজেগান পড়া এবং নিয়মিতভাবে এর ওপর আমল করার বিধান কী? এটা মাকরূহ বা বিদআত না তো?

উত্তর : এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় রয়েছে : একতো হলো– ধারাবাহিকতা, দ্বিতীয় বিষয় হলো– হঠকারিতা ও বাড়াবাড়ি। উভয়টার বিধানের মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। মুস্তাহাব বিষয়ের ওপর ধারাবাহিক আমল করা মন্দ নয়। কিন্তু মুস্তাহাব বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকে ফুকাহায়ে কেরাম মাকরূহ বলেছেন। আর "ইসরার" বা বাড়াবাড়ি বলা হয় কোন মুস্তাহাব কাজকে জরুরী মনে করে সর্বদা করা এবং অন্য কেউ না করলে তাকে গুনাহগার বলে উপহাস ও অপমানিত করা, এটা মাকরূহ। পক্ষান্তরে মুস্তাহাব বিষয় ধারাবাহিক করলে তা মুস্তাহাবই থাকবে, যদি তা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা হয়। যেমন: কোন ব্যক্তি অযুর পর তাহিয়্যাতুল অযু পড়তে অভ্যস্ত। সে সব সময় এ অনুযায়ী আমল করে, কিন্তু এটাকে জরুরীও মনে করে না, আর কেউ না করলে তাকে গুনাহগারও মনে করে না বা তাকে নিয়ে উপহাস ও অপমানিত করে না, তাহলে এতে কোন কারাহাত নেই। অতএব চিকিৎসা হিসেবে যে সব আমল করা হয় কিংবা কোন বিশেষ কারণে বা উপলক্ষে করা হয়, চিকিৎসার প্রয়োজন যখনই হবে কিংবা যখনই বিশেষ কারণ পাওয়া যাবে ঐ আমল তখন করা যাবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব অনুযায়ী প্রতিদিন ফজর নামাযে কুনূতে নাযেলা পড়া হয়, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. বিশেষ মারাত্মক বিপদের সময় তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন, এর কারণ মারাত্মক বিপদ স্থির করেছেন। অতএব যতক্ষণ বিপদ থাকবে তখনই কুনূতে নাযেলা পড়া যাবে, বিপদ দূর হয়ে গেলে আর পড়া যাবে না।

খতমে খাজেগান বরকত লাভের আশায় পড়া হয়।

বুযুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতালব্দ অভিমত হচ্ছে এ খতমের বরকতে দু'আ কবুল হয়। আর মু'মিনের কোন্ সময় এমন আছে যাতে বরকত লাভের আশা থাকেনা? যেহেতু এ খতম বরকত লাভের উদ্দেশ্যেই পড়া হয়, তাই যখনই বরকত লাভের আগ্রহ হয়, তখনই তা পড়তে পারবে, অর্থাৎ সবসময়ই তা পড়া যাবে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

সোয়া লাখের খতম

প্রশ্ন : বিপদ মুসিবত থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে একলাখ পঁচিশ হাজার বার কালিমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করা হয়। এর প্রমাণ কী? এছাড়া উক্ত সংখ্যা নির্ধারন করা বিদআত কিনা?

উত্তর : মুসিবত থেকে মুক্তি লাভের জন্য যে খতম পড়া হয় তা নিছক চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। এর জন্য কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ জরুরী নয়। বরং তা কুরআন হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক ও শরীয়ত বিরোধী না হওয়াই যথেষ্ট। আর এতে যে সংখ্যা নির্ধারিত রয়েছে তা নামাযের রাকাত সংখ্যা বা তাওয়াফের চক্করের সংখ্যার পর্যায়ের নয় যে, এর জন্য কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা জরুরী, বরং তা ডাক্তার ও হাকীম এর প্রেসক্রিপশন লেখার মত। যাতে লিখা থাকে উন্নাব ৫ টা, বাদাম ৭টা। এটা হচ্ছে অভিজ্ঞতালব্দ প্রেসক্রিপশন। তাই এর জন্য কুরআন হাদীসের প্রমাণ তালাশ করা অযৌক্তিক। সুতরাং খতমে খাজেগান এর উদ্দেশ্য যখন চিকিৎসা হয় তখন তা বিদআত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর অভিজ্ঞতার আলোকে কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা শরীয়ত বিরোধী নয়। চিকিৎসার জন্য সাত কূপের পানি সাতটি পাত্রে জমা করার বিষয়টা স্বয়ং হাদীস শরীফ দ্বারাই প্রমাণিত। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১২/ ১২৩

বিপদের সময় সূরা ইয়াসীন খতম করা

মাসআলা : বিপদ মুক্তির উদ্দেশ্যে এবং বরকত লাভের আশায় ইয়াসীন শরীফের খতম করা বুযুর্গানে দ্বীনের পরীক্ষিত আমল। অতএব মুসিবতের সময় বিপদ মুক্তি ও চিকিৎসার লক্ষ্যে সূরা ইয়াসীনের খতম করা যাবে। তবে এটাকে সুন্নত কিংবা শরয়ী হুকুম মনে করা যাবে না। আর যারা খতম করে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করা কিংবা তাদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা রাখা যাবে না। -ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪৭০

সদকার নিয়তে নদীতে পয়সা নিক্ষেপ করা

মাসআলা :সদকার উদ্দেশ্যে নদীতে পয়সা নিক্ষেপ করা সম্পদ নষ্ট ছাড়া কিছুই নয়। এটা কোন সদকা নয়। এর দ্বারা সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। –আপকে মাসায়েল : ৮/১২৯

বাড়ির ভিত্তি প্রস্তরে রক্ত দেয়া

মাসআলা : নতুন বাড়ি নির্মানের সময় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে বকরী যবাই করে রক্ত ঢেলে দিয়ে বকরীর গোশত গরীবদের মাঝে বন্টন করা, বা ভিত্তি প্রস্তরে স্বর্ণ রূপা দেয়ার শরয়ী কোনো ভিত্তি নেই।

–আপকে মাসায়েল : ৮/১২৮

নতুন বাড়ি বা দোকানে আনন্দ করা

মাসআলা : নতুন বাড়ি উদ্বোধনের সময় আনন্দ প্রকাশার্থে মিষ্টি বিতরণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে মিষ্টি ইত্যাদি বন্টন করতে গিয়ে অহংকার কিংবা লৌকিকতা যাতে উদ্দেশ্য না হয় সেদিকে সচেতন থাকতে হবে। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৭/৩০৪

পূজার জন্য চাঁদা দেয়া

প্রশ্ন : আমার অফিসে হিন্দু কর্মকর্তা কর্মচারীরা প্রতি বৃহস্পতিবার পূজার জন্য চাঁদা উসূল করে। তাদেরকে চাঁদা না দিলে তাদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এদেরকে চাঁদা দেয়ার বিধান কী? এছাড়া পূজার মিষ্টির শরঈ বিধান কী?

উত্তর : যদি চাঁদা দেয়া ছাড়া মুক্তি পাওয়া না যায় তবে চাঁদা উসূল কারীদেরকে মালিক বানিয়ে দিয়ে দিবে। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করবে। তদ্রূপ পূজার মিষ্টি গ্রহণ করতে একান্ত বাধ্য

হলে তা গ্রহণ করে পরবর্তীতে কোন জানোয়ারকে খাইয়ে দিবে। পূজা এবং দেব-দেবীর নামে মান্নতকৃত মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়া যাবে না।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৭/৪৮২

অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে মোবারকবাদ জানানো

মাসআলা : অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের দিনে তাদেরকে অভিনন্দন দেয়া কিংবা অভিনন্দন বার্তা পৌছে দেয়ার বিধান হচ্ছে যদি কোন শিরকী বা কুফরী বাক্য তাতে ব্যবহার করা না হয় তাহলে অনুমতি আছে, অন্যথায় এর অবকাশ নেই। –নেযামুল ফাতাওয়া : ১/৪৮

অমুসলিমদের ফাল্গুনী উৎসবে অংশ নেয়া

যেখানে কবর পূজা এবং তাজিয়া পূজার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা নিষিদ্ধ, সেখানে হোলী বা ফাল্গুন উৎসবে– যেখানে লাকড়ী জালিয়ে চতুপার্শ্বে চক্কর দেয়া, সেজদা করা এবং বাজি ইত্যাদি ফোটানো হয়– যা মুশরিকদের কার্যকলাপ তা তো অবশ্যই হারাম।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১/১৫, মাহমূদিয়া : ১৭/২৬৯

মাসআলা : মুসীবতের সময় إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়ার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে নিদের্শনা এসেছে। কোন অমুসলিমের মৃত্যু যদি কারো নিকট মুসীবত বলে মনে হয় তবে সে তা পড়তে পারবে। কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে পাপিষ্ঠ লোক মরার দ্বারা আল্লাহর জমিন এবং আল্লাহর বান্দাহগণ আনন্দ লাভ করে। –আপকে মাসায়েল : ৮/৩০৫

সূর্যগ্রহণ এবং গর্ভবতী নারী

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, সূর্য গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলা এবং তার স্বামী কোন কিছু কাটাকাটি করলে তাদের সন্তান অঙ্গ কর্তিত অবস্থায় ভুমিষ্ট হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে কথাটি সঠিক কিনা?

উত্তর : সূর্য গ্রহণের সময় দান সদকা, তওবা ইস্তেগফার করা, নামায এবং দু'আয় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে নির্দেশ এসেছে। এর অতিরিক্ত কোন বিষয়ের আলোচনা আসেনি। অতএব এটাকে শরয়ী বিষয় মনে করা যাবে না। এগুলো অমুসলিমদের সমাজ ব্যবস্থার কুপ্রথা যা

আমাদের সমাজেও স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে। তবে কোন বিজ্ঞ ডাক্তার বা চিকিৎসক যদি অভিজ্ঞতালব্দ কোন পরামর্শ দিয়ে থাকেন তা ভিন্ন কথা।

—আপকে মাসায়েল : ৮/২২৫

মাসআলা : চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণের সময় খানা খাওয়া নিষিদ্ধ, এ ধারণাটিও ভিত্তিহীন। অবশ্য এ সময়টা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশের মোক্ষম সময়, সেজন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যস্ততা বর্জন করা ভিন্ন কথা। এদিকে দুনিয়ার সকল ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে এমনকি গুনাহের কাজও চলতে থাকে; অথচ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করাকে জরুরী মনে করে। এটাতো শরীয়তকে বিগড়ানোর নামান্তর যা বিদআত। —আগলাতুল আওয়াম : ১৮৯

বিসমিল্লাহ এর পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা

মাসআলা : ৭৮৬ বিসমিল্লাহ শরীফের সংখ্যা। বুযুর্গদের থেকে এ সংখ্যা লেখার প্রচলন চলে আসছে। সম্ভবত এটা এজন্য অবলম্বন করা হয়েছে যে, চিঠিপত্র ইত্যাদিতো ছিড়ে ফেলে দেয়া হয়। আর বিসমিল্লাহ লিখা হলে এভাবে بسم الله এর সাথে বেয়াদবি হয়। এই বেয়াদবি হতে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই যথাসম্ভব বুযুর্গগণ এই সংখ্যা লিখার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তবে যদি বেয়াদবির আশংঙ্কা না থাকে তাহলে بسم الله الرحمن الرحيم (পুরোটাই) লেখা চাই। —আপকে মাসায়েল : ৮/৩৪৮

মাসআলা : ৭৮৬ লিখার দ্বারা بسم الله এর সওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ এটাতো بسم الله নয়; বরং তার সাংকেতিক সংখ্যা মাত্র।

—ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ১৮/৩৫

মাসআলা : অনেকে চিঠি পত্রের মধ্যে السلام عليكم এর পরিবর্তে مسنون سلم লিখে থাকে। চিঠিতে যদি 'সালামে মাসনূনের পর সমাচার' এভাবে লিখে তাহলে যেহেতু শরীয়তে এটি সালামের বাক্য নয়; বরং السلام عليكم হচ্ছে সালামের বাক্য, তাই এই বাক্যের জবাব দেয়া ওয়াজিব হবে না। যদিও سلام مسنون লেখা জায়েয।

ফায়দা : এর থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, আকাবেরদের কেউ কেউ চিঠিতে পূর্ণ সালাম এর পরিবর্তে সালামে মাসনূন লিখতেন যাতে প্রাপক এবং সম্বোধিত ব্যক্তির উপর সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব না হয়ে যায়। বিশেষ সতর্কতা হিসেবে তারা এমনটি করতেন। তদ্রূপ হাঁচি

দিয়ে الحمد لله উচ্চ আওয়াজে না বলতে এবং তিলাওয়াতে সিজদা জোরে তিলাওয়াত না করার শিক্ষাও দিয়ে গেছেন। —আগলাতুল আওয়াম : ১৩১

শোকের উপলক্ষ এবং মেহমান দারী

মাসআলা : মৃত্যুর শোক উদযাপনে মৃত্যুর তৃতীয় দিন অনুষ্ঠান করা, পঞ্চমা, চল্লিশা, ৬ষ্ঠ মাসী মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের প্রথা প্রচলিত রয়েছে, যা খুব গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। এমনকি নিজের সামর্থ্য না থাকলে ঋণ করে হলেও এসব কুসংস্কার পালন করার চেষ্টা করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে মানুষ বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানের ন্যায় আনন্দ উৎসবের সাথে অংশ গ্রহণ করে। মহিলারা বিশেষ জাকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করে থাকে। এসব কাজ বিদআত এবং নাজায়েয।

মাসআলা : মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কিছু দু'আ দরূদ পাঠ করে, বা গরীবদেরকে খানা খাইয়ে কিংবা কিছু দান সদকা করার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। তদ্রূপ মৃতের জন্য ঈসালে সাওয়াবের বিষয়টিও নিঃসন্দেহে বৈধ। এর সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় সদকা এবং দৈহিক ইবাদতের মধ্যে নামায, রোযা, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ও দরূদশরীফ ইত্যাদি আদায় করে নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য ঈসালে সাওয়াব করবে। এমনিভাবে নিজের বন্ধুবান্ধবের নিকট ঈসালে সওয়াবের জন্য আবেদন করবে। তারাও কিছু পাঠ করে কিংবা দান সদকা করে ঈসালে সাওয়াব করবে।

ফকীহ হাফেযুদ্দীন ইবনে শিহাব কারদারী রহ.(মৃত্যু-৮২৭ হি.) বলেন—

ويكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة۔ لأنها أيام غم۔ فلا يليق فيها ما يختص باظهار السرور۔ وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا۔

মুসিবতের দিনসমূহে দাওয়াত করা মাকরূহ, কেননা এটাতো শোকের সময়। আর শোকের সময় আনন্দ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তবে গরীব মিসকীনদের জন্য খানা পাক করা উত্তম। —ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়া, কিতাবুল ইসতিহসান, ৩/২১৬ (দারুল ফিকর)

মুফতী আযম মুফতী কেফায়াতুলাহ রহ. বলেন-

উত্তর : মৃতদের উদ্দেশ্যে ঈসালে সাওয়াব করা উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ। দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত উভয়টার সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায় কিন্তু ঈসালে সাওয়াবের জন্য শরীয়ত যে সব পদ্ধতি নির্ধারণ করে নি, সে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং ঐসব পদ্ধতিকে ঈসালে সাওয়াবের জন্য শর্ত কিংবা উপকারী মনে করা বিদআত। ঈসালে সাওয়াবের শরয়ী পদ্ধতি হচ্ছে নফল নামায, নফল রোযা, কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ ইত্যাদি আমল করে এর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেয়া এবং এভাবে দু'আ করা হে আল্লাহ! আমি যে নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, কুরআন তিলাওয়াত এবং দরূদ শরীফ পাঠ করেছি আপনার দয়া ও মেহেরবানীতে এর সাওয়াব অমুক ব্যক্তিকে পৌঁছিয়ে দিন। এমনিভাবে আর্থিক কোন ইবাদতের সাওয়াব পৌঁছানোর ইচ্ছা হলে সামর্থ্য অনুযায়ী ইখলাসের সাথে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করবে, মসজিদ নির্মাণ করবে, কূপ খনন করবে, সরাইখানা ও মুসাফিরখানা নির্মাণ করবে এবং দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে উপরোক্ত পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করবে, যাকে খুশি তার জন্য ঈসালে সাওয়াব করবে।

ঈসালে সাওয়াবের সঠিক পদ্ধতি এটাই। এর জন্য কোন দিন তারিখ নির্ধারিত করা, আর নির্দিষ্ট তারিখকে সওয়াব পৌঁছার শর্ত কিংবা কোন শরয়ী দলীল ব্যতীতই সওয়াব বৃদ্ধির ও আধিক্যের জন্য শর্ত ও উপকারী মনে করা, নির্দিষ্ট বস্তু স্থির করা, নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন ও নির্ধারণ করা, যেমন-বিশেষ কোন কবরে সদকা করা কিংবা জানোয়ার সাথে নিয়ে যাওয়াকে জরুরী বা উপকারী মনে করাসহ বহু কুসংস্কারের বিস্তার ঘটেছে। এ সবই শরীয়ত বিরোধী এবং বিদআত।

খানা সামনে রেখে সূরা ফাতেহা পাঠ জরুরী মনে করাও ভিত্তিহীন। খানা সদকা করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, সদকা করে দাও, যদি কুরআনে কারীম তিলাওয়াত বা দরূদ শরীফের সওয়াব উদ্দেশ্য হয় তবে তাই কর। কিন্তু এতদুভয়ের সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য খানা সামনে নিয়েই তা পড়তে হবে এমনটি শর্ত নয়। এরূপ শর্ত করা শরীয়ত বিরোধী। তদ্রূপ তা বিবেক বিরোধীও। মোটকথা হচ্ছে ঈসালে সাওয়াব জায়েয এবং উত্তম কাজ বটে, কিন্তু এর প্রচলিত পদ্ধতিগুলো নাজায়েয ও বিদআত।

–কেফায়াতুল মুফতী : ৪/১১২-১১৩

মাজারে ওরস ও কাওয়ালী পাঠ করা

মাসআলা : কবর যিয়ারত নিঃসন্দেহে সুন্নত। কবরে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ করা, ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে দু'আ করা, ফাতেহা পাঠ করে সওয়াব পৌঁছানো এসবই জায়েয। কিন্তু প্রথাগত ওরস যা শরয়ী বিধান হিসেবে আবশ্যক মনে করে মৃত্যু তারিখে প্রতিবছর যেভাবে আয়োজন করা হয় তা নাজায়েয ও বিদআত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র যুগে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, এটি বিধর্মীদের সংস্কৃতি। এটি যদি ইসলামী বিধান বা দ্বীনি বিষয় হতো তবে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওরস করতেন। অথচ হাদীসে এ বিষয়ে কঠিন ভাষায় নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন لا تجعلوا قبري عيدا তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্পট বানিয়োনা। —মিশকাত শরীফ : ৮৬

অর্থাৎ, অমুসলিম আহলে কিতাবরা যেভাবে তাদের ধর্মীয় উৎসবে নির্দিষ্ট তারিখে একত্রিত হয়, আমার কবরেও তোমরা সেভাবে একত্রিত হয়ো না। অমুসলিমদের উৎসবে তিনটি বিষয় একত্রিত হয়। ক. তারিখ নির্ধারণ করা খ. সমবেত হওয়া এবং গ. হাঁসি তামাশা ও উৎসব করা।

উক্ত হাদীস দ্বারা কোন নির্দিষ্ট তারিখে মাজারে একত্রিত হয়ে উৎসব করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পটনী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

لا تجتمعوا الزيارته اجتماعكم للعيد ,فانه يوم لهو وسرور ,وحال الزيارة بخلافه ,
وكان دأب أهل الكتاب. فاورثهم القسوة

'হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবর যিয়ারতের জন্য ঈদের ন্যায় একত্রিত না হওয়া চাই। কারণ ঈদের দিন তো হচ্ছে হাসি খুশি ও আনন্দ উৎসব এবং খানা পিনা করার দিন। আর কবর যিয়ারতের অবস্থা এর থেকে ভিন্ন। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য থাকে উপদেশ গ্রহণ, মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী আখেরাতের চিন্তা এবং নিজের পরিনাম কি হবে তা স্মরণ করা। কবরে ওরস করা আহলে কিতাবদের আবিস্কৃত প্রথা এর ফলে তাদের অন্তর সমূহ কঠিন হয়ে গেছে।'

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওয়া মুবারক যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ নির্ধারিত নেই। সারা বছরই অসংখ্য অগণিত রাসূল প্রেমিক এসে যিয়ারত করে উত্তম প্রতিদান ও পূণ্য অর্জনে ধন্য হন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযাতেই তো ওরস কিংবা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, তাহলে অন্যান্য বুযুর্গদের মাযারে ওরস বৈধ হয় কিভাবে? এজন্যই বুযুর্গানেদ্বীন, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচলিত ওরসকে নাজায়েয লিখেছেন।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪০৯

কাযী সানাউলাহ পানিপথী রহ. তাঁর তাফসীর সংকলন, 'তাফসীরে মাযহারী'তে উল্লেখ করেন, মূর্খ লোকেরা আল্লাহর ওলী এবং শহীদদের কবর সমূহে যেসব কাজ করে থাকে– যেমন : কবর সেজদা করা, কবরের চার পাশে প্রদক্ষীণ করা, বাতি জালানো, ঈদ উৎসবের ন্যায় প্রতিবছর তাতে জামায়েত হওয়াসহ ওরসের নামে যেসব কাজ করা হয়, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই, এগুলো নাজায়েয। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৩১৯

মাসআলা : মহিলাদের মাযারে এবং ওরস অনুষ্ঠানে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ হচ্ছে-ই'তিকাদী ও ইলমী ঝুঁকি থেকে বাঁচানো। পুরুষদের জন্যও ওরস এর পরেই মাযারে যাওয়া উচিত। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ওরস অনুষ্ঠানে বিদআত এবং শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ হয়, আর সাধারণ মুসলমান নিজেদেরকে এসব বিষয় থেকে মুক্ত রাখতে পারে না। এদিকে আল্লাহর ওলীদের মাযারে গিয়ে এসব গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া আরো জঘন্যতম অপরাধ। –রহীমিয়া থেকে সংক্ষেপিত : ২/৩০৯,

ফাতাওয়া রশীদিয়া : ৫৫৫

মাসআলা : বুযুর্গদের মাযারে ওরস করা, চাদর জড়ানো এবং তাদের নামে মান্নত করা হারাম। শুরুর দিকে ওরস উপলক্ষে কোন বুযুর্গের ইন্তেকালের পর তার মুরিদ ও ভক্তবৃন্দ কোন এক স্থানে একত্রিত হয়ে কিছু ওয়ায নসীহত শুনত। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এই উদ্দেশ্য দূরীভূত হয়ে যায় এবং পীর সাহেবদের গদ্দিনশীন উত্তরাধিকারীরা ওরস এর নামে যুবুর্গদের কবরে নানা ধরনের বিদআত ও হারাম কর্যাবলী এবং বিভিন্ন কুসংস্কার ও

কুপ্রথার জোয়ার বইয়ে দেয়। মাজার ব্যবসার রমরমা অবস্থা দেখে অনেক স্থানে স্বার্থান্বেষী মহল কৃত্রিম কবর বানানো আরম্ভ করে। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

মাসআলা : চল্লিশা এবং মৃত্যুবার্ষিকী যদি সওয়াবের কাজই হত তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে সালেহীন বুযুর্গানে দ্বীন অবশ্যই এ কাজ করতেন, কোনোভাবেই তা বর্জন করতেন না। তাঁরাতো ছিলেন পূণ্যের কাজে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। নেক কাজের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল প্রবল। এতদসত্ত্বেও দুর্বল কোন বর্ণনাও এর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পাওয়া যায় না। বরং হযরত ওলামায়ে কেরাম এগুলোকে বিদআত ও নাজায়েয বলে আসছেন যুগ যুগ ধরে। অবশ্য মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাদের নিকট যাওয়া, কুরআন তিলাওয়াত করা কিংবা গরীবদেরকে কিছু খাইয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে ঐ সাওয়াব পৌঁছানো যাবে। তবে এর জন্য কোন দিনক্ষণ নির্ধারণ করা যাবে না এবং তা লৌকিকতার উদ্দেশ্যেও হতে পারবে না।

–ইমদাদুল মুফতীন : ১/১১

মাসআলা : অনেকে কবরের উদ্দেশ্যে মান্নত করে। এর দ্বারা ওলীদের নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য থাকে। আর ওলীদেরকে নিজেদের জন্য প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে এই আকীদা পোষণ করা শিরক। তাই এ উদ্দেশ্যে মান্নতকৃত খাবার খাওয়াও জায়েয নয়। وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ হিসেবেই তা অবৈধ হয়।

মাসআলা : অনেকে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, মিসকীনদেরকে দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আর মাযারে যেহেতু গরীব লোকজন একত্রিত হয়, এ জন্য সেখানে নিয়ে যাই। বাস্তবে এটা একটা অপকৌশল মাত্র। কেননা এই মিসকীনদের সাথে রাস্তায় সাক্ষাত হলে এবং তারা তার নিকট এসব খাবার প্রার্থনা করলেও রাস্তায় তো তাদেরকে সামান্য পরিমাণ খাবারও দেয় না। বরং এই কথা সাফ বলে দেয়, যেখানের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে সেখানেই পৌঁছানো হবে। ঐ স্থানতো এখনো আসেনি। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কবরই মূল উদ্দেশ্য, মিসকীনরা উদ্দেশ্য নয়। কবরে গিয়ে সেখানকার মিসকীনদের মাঝে খাবার, বস্ত্র সামগ্রী ইত্যাদি বন্টন করেই দিতে হয় তাহলে কবরে রেখে লাভ হলো কী? –ইসলাহুর রুসূম : ১২৫

কবরে সিজদা করা

মাসআলা : কবরে সিজদা করা হারাম।

❖ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি, বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ সময়ে বলতেন,

لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.

অর্থাৎ, ইয়াহুদী নাসরাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক, তারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।

–বুখারী শরীফ : ১/১৭৭, মিশকাত শরীফ : ৬৯।

عن جندب رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول :الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ,انى انهاكم عن ذلك.

❖ হযরত জুনদুব রাযি. বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা তাদের নবীগণ এবং ওলীগণের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়েছিল। আমি এ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি। (তোমরা এমনটি অবশ্যই করবে না)। –মুসলিম শরীফ : ১২১৬

عن عطاء بن يسار قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ,اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.

❖ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তি বানাবেন না যা পূজা অর্চনা করা হবে। যারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানায় তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ প্রবল হয়।

–মিশকাত শরীফ : ৭২০

❖ হযরত কায়স ইবনে সা'দ রাযি. বলেন, আমি 'হীরা' নামক এলাকায় গিয়ে দেখি সেখানকার লোকজন তাদের নেতাকে সিজদা করছে। এদৃশ্য দেখে আমার অন্তরে এ বিষয়টি ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হচ্ছেন সিজদা পাওয়ার সর্বাধিক

যোগ্য। সেখান থেকে ফিরে আসার পর অমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে পুরা ঘটনা খুলে বললাম এবং আমার অন্তরের আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করে বললাম! হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিই সিজদা পাওয়ার অধিক হকদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন–

ارايت لو مررت بقبری اکنت تسجد له؟ فقلت :لا !فقال :لا تفعلوا ,لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد .لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق .رواه ابو داؤد

যদি তুমি আমার কবর অতিক্রম করতে তবে কি তা সিজদা করতে? (বর্ণনাকারী বলেন) আমি বললাম জি না। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তাহলে আমার জীবদ্দশাতেও তা করোনা। যদি কারো প্রতি অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ করতাম তবে স্ত্রীদেরকে আদেশ করতাম তারা যেন তাদের স্বামীদের সিজদা করে। আল্লাহ পাক স্বামীদেরকে যে অধিকার দিয়েছেন সে অধিকার বলে (তারা সিজদা পাওয়ার যোগ্য হতো।)

–আবূ দাউদ : ২১৪২,
মিশকাত শরীফ : ৩২৬৬

❖ একদা একটি উট এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদা করে বসে। এ দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে তো জীবজন্তু এবং বৃক্ষলতা সিজদা করে অথচ আমরা আপনাকে সিজদা করার আরো বেশি হকদার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং তোমাদের ভাইয়ের সম্মান করো। (অর্থাৎ সিজদা ও ইবাদতের একমাত্র যোগ্য হলেন আল্লাহ তা'আলা)।

–মিশকাত শরীফ : ২৮৩, মুসনাদে আহমদ : ২৪৪৭১

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى نفر من المهاجرين والأنصار ,فجاء بعير فسجد له ,فقال أصحابه :يا رسول الله !تسجد لك

البهائم والشجر ـ فنحن احق أن نسجد لك ـ فقال :اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولوكنت امر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

উপরোক্ত হাদীস সমূহ নিয়ে চিন্তা করলে পরিস্কার হবে যে কবর পূজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কতইনা মারাত্মক ও জঘন্যতম গুনাহ ছিল। এ বিষয়ের জঘন্যতা এবং নিকৃষ্টতার প্রতি লক্ষ রেখে কেমন শক্ত ও কঠোর বক্তব্যের মাধ্যমে উম্মতকে নিষেধ করেছেন। যে কবরে সিজদা দেয়া হয় তাকে মূর্তির সাথে তুলনা দিয়ে সিজদা কারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং আল্লাহর ক্রোধ প্রাপ্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

কবরে সিজদার ব্যাপারে হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. 'মালাবুদ্দাহ্ মিনহু' কিতাবে লিখেন- "আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং ওলীগণের কবরে সিজদা করা, কবরের তাওয়াফ করা, তাঁদের নিকট কিছু প্রার্থনা করা এবং তাদের নামে মান্নত করা হারাম। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে এসব কাজ কুফর পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজগুলোর জন্য অভিসম্পাত করেছেন এবং এ ধরণের কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো ঘোষণা করেছেন- "তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানাবে না।" (অর্থাৎ কাফেররা যেভাবে মূর্তিকে সিজদা করে আমার কবরের সাথে তোমরা সে রকম আচরণ করবে না)। -ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪১৪-৪১৬

কবরের তাওয়াফ করা

মাসআলা : কবরের তাওয়াফ বা প্রদক্ষীণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। এ ধরনের কাজ করার দ্বারা তাওয়াফকারী ব্যক্তি ফাসেক ও পাপিষ্ঠ হয়ে যায়, আর মুস্তাহাব এবং বৈধ মনে করে করলে তা কুফরীর পর্যায়ে পৌছে যাবে।

মোল্লা আলী কারী রহ. শরহুল মানাসেক কিতাবে লিখেন ولا يطوف الخ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা আতহারের তওয়াফ করবেনা, কারণ তাওয়াফ কা'বা শরীফের সাথে নির্দিষ্ট। তাই আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং ওলীদের কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হারাম।

-ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪১৩

কবরে বাতি জ্বালানো

মাসআলা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে বাতি জ্বালাতে শুধু নিষেধই করেন নি, বরং এ কাজ যারা করবে তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন।

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال :لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.

অর্থ : 'হযরত আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সব নারীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন যারা কবরস্থানে আনাগোনা বেশি করে। তদ্রূপ ঐ সব পুরুষদেরকেও অভিসম্পাত করেছেন যারা কবরকে সিজদার স্থান বানায় এবং কবরে বাতি জ্বালায়।' –আবু দাউদ, তিরমীযি ও নাসাঈ

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন- কবরে বাতি জ্বালাতে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, এতে অহেতুক সম্পদ অপচয় হয়; যা দ্বারা কারোই কোন উপকার হয় না। তাছাড়া আগুন হচ্ছে জাহান্নামের নিদর্শন, তাই এ থেকে কবরকে পবিত্র রাখা বাঞ্ছনীয়। অথবা কবরকে শরীয়ত বিরোধী সম্মান প্রদর্শন থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যেই উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। কবরে সিজদা করতে যেভাবে নিষেধ করা হয়েছে তদ্রূপ একই উদ্দেশ্যে কবরে বাতি জ্বালানোর ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪১৩

কবরে ফুল ছিটানো

কবরে ফুল ছিটানো নিষেধ। হাদীস শরীফে এতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এই কবর দু'টিতে শাস্তি হচ্ছে, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুরের কাঁচা ডাল নিয়ে দুই ভাগ করে উভয় কবরে পুতে দিয়ে বললেন, খেজুর ডাল যতক্ষণ আদ্র থাকবে আশা করা যায় তাদের শাস্তি হালকা করা হবে।

–বুখারী শরীফের উদ্ধৃতিতে মিশকাত শরীফ : ৪২

যদি বাস্তবে এই হাদীসের ওপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে সর্বোচ্চ খেজুরের কাঁচা ডাল পুতে দেয়া যেতে পারে। এর অতিরিক্ত ফুল

ছিটানোর কোন বৈধতা হতে পারেনা। তাছাড়া ডালতো ফ্রী পাওয়া যায়, অথচ ফুল কেনার জন্য অনেক টাকা ব্যয় হয়। এ টাকা গুলো ঈসালে সাওয়াবের নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করলে মৃত ব্যক্তির আরো অধিক সওয়াব হওয়ার আশা করা যায়।

উল্লেখ্য যে, ফুল ছিটানোর উদ্দেশ্য হবে, হয়তো মৃতব্যক্তির নৈকট্য লাভ, যা হারাম হওয়া সুস্পষ্ট অথবা তা হবে শুধুমাত্র প্রথা হিসেবে যা অপব্যয় এবং হিন্দুদের সাথে সাদৃশ্যতা। আর কোন মুসলমানের জন্য হিন্দু বা বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। –মা-লাবুদ্দা মিনহু : ১৩১

মাসআলা : মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াবের উত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, দু'আ-দরূদ ইত্যাদি পড়ে বা দান সদকা করে মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য দু'আ করা। এটা মৃতের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও লাভজনক। এর মাধ্যমে মৃতদের আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। আর এটিই হচ্ছে সুন্নত পদ্ধতি।

আমি বলব, ফুল ছিটানোর পক্ষে পূর্বোল্লেখিত হাদীস শরীফ দ্বারা দলীল পেশ করা একেবারেই অযৌক্তিক। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে খেজুরের ডাল পুতেছেন, ফুল ছিটাননি। সুতরাং তাদের উদ্দেশ্য যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণই হয় তাহলে তারা সর্বোচ্চ খেজুরের ডালই পুতে দিত, ফুল ছিটাতো না। এতে প্রমাণিত হয়, তাদের উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ নয়।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের ডালের টুকরা গুনাহগারের কবরে গেড়েছেন, নেককারদের কবরে গাড়েননি। কিন্তু তারা এমনটি করেনা, বরং এমন লোকদের কবরেও ফুল ছড়িয়ে থাকে যাদের কবরে আযাব হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং বুঝা গেল তাদের উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ নয়। আর উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা শরীয়তের বিধান বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত। –ইমদাদুল মাসায়েল : ৮৪, ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪১৫

মাসআলা : মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর কবরের ওপর পানি ঢেলে দেয়া জায়েয। কবরে ফুল ছিটানো সুন্নত বিরোধী এবং আটা, তেল

ইত্যাদি দেয়া অপব্যয় ও অহেতুক কাজ, আর আগরবাতি জালানো মাকরূহ এবং নিষিদ্ধ। —আপকে মাসায়েল : ১/৩১৬

মাসআলা : পানি ডালার দ্বারা উদ্দেশ্য থাকবে কবরের মাটিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া থেকে বোধ করা। এছাড়া এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হওয়ার আকীদা রাখা যাবে না। আর এভাবে পানি ডালাকে জরুরী বা সওয়াবের কাজ মনে করা বিদআত। —আহসানুল ফাতওয়ায় : ৪/২২৪

কবরে চাদর ঝুলানো

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বলল যে, কাবা শরীফে গিলাফ টানানো হয়, তাহলে কবরে চাদর টানাতে দোষ কী?

উত্তর : হাদীস শরীফে দেয়ালে চাদর ঝুলানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে, অথচ ব্যাহ্যত তাতে কোন মন্দ বিষয় অথবা শিরক এর সন্দেহ নেই। আর কবরে চাদর ঝুলানোর মধ্যে শিরক এর সন্দেহের পাশাপাশি গায়রুল্লাহ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়ে থাকে, তাই এটা আরো জঘন্যতম নাজায়েয কাজ। —রদ্দুল মুহতার : ১/৮২৯,
ইমদাদুল মাসায়েল : ১/২০১

কাবা শরীফের ক্ষেত্রে ভিন্ন বিধান প্রযোজ্য। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কা'বা শরীফে গিলাফ পরিধান করিয়েছেন। যেহেতু কা'বা ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শিরক এর কারণ হয় না; তাইতো নামাযের সময় কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরানো জরুরী। অথচ কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া মাকরূহ। —আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৭৬, ইমদাদুল আহকাম : ১/১৮৪

মাসআলা : জানাযার ওপর ফুলের চাদর দেয়া বিদআত।
—ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/৯৮, আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৭৮

মাসআলা : মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় কবরে কেওড়া ইত্যাদি ছিটানোর শরঈ ভিত্তি নেই। —আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৭১

কবরে আযান দেয়া

প্রশ্ন : শয়তানের ক্ষতি থেকে মৃত ব্যক্তিকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে মৃতকে কবরস্থ করার পর কবরে আযান দেয়ার বিধান কী?

উত্তর : কবরে আযান দেয়া সুন্নত বিরোধী, মনগড়া বিদআত এবং ভিত্তিহীন কাজ যা অবশ্য বর্জনীয়।

মাসআলা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাঁরা হাজার হাজার মৃত ব্যক্তি দাফন করেছেন। কবরের শাস্তি এবং শয়তানের ক্ষতি ও প্রতারণার বিষয়ে তাঁরা সবাই অবগত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও কবরে আযান দেয়া তাঁদের কারো থেকেই প্রমাণিত নয়। তাঁরা কি তাঁদের মৃতদের শুভাকাঙ্খী ছিলেন না? সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যেহেতু কবরে আযান দেননি তাই কারো জন্যই কবরে আযান দেয়া জায়েয নয়।

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন, কবরে আযান দেয়া বিদআত। নবজাতকের কানে দেয়া আযানের ওপর কিয়াস করে কবরের আযান যারা বৈধ করতে চায়, তাদের এ কিয়াস শুদ্ধ নয়, এবং তারা প্রকাশ্য ভুলের শিকার। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৬/২০৬ ফাতাওয়া শামী : ১/৮৩৭,
ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৫/৩৮২

মাসআলা : মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর একাকী এবং যৌথভাবে মৃতের জন্য মাগফেরাতের দু'আ করা এবং মুনকার নাকীর ফেরেস্তাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে দৃঢ়পদ থাকার জন্য দু'আ করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। –আবুদাউদ শরীফ : ২/২০৩
ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/১৯৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৬/২০১,
ফাতাওয়া আলমগীরী : ১/১৬৬, ফাতাওয়া রশীদিয়া : ১৪৫

মাযারে টাকা পয়সা দেয়া

প্রশ্ন : আমি যে রাস্তায় গাড়ি চালাই তাতে একটি মাযার রয়েছে। মাযারে দেয়ার জন্য লোকজন আমার কাছে টাকা পয়সা দিয়ে থাকে। মাযারে টাকা দেয়ার বিধান কী?

উত্তর : মাযারে টাকা দেয়ার সময় যদি সেখানকার ফকীর মিসকীনদেরকে দেয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা জায়েয। কিন্তু তা দ্বারা যদি মাযারে নযরানা পেশ করা এবং মাযার ওয়ালার নামে মান্নত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে না জায়েয হবে। এটাতো মূলনীতির আলোকে জবাব দেয়া হলো। বর্তমানে লোকজনের অবস্থা দৃষ্টে পরিলক্ষিত হয় যে এক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য দ্বিতীয় প্রকারই হয়ে থাকে। অতএব মাযারে টাকা পয়সা দেয়া নিষিদ্ধ বলতে হবে। –আপকে মাসায়েল : ১/২১৫

মৃত ব্যক্তিকে ডাকা

মাসআলা : কোন আলেম কিংবা ওলীর মাযারের পাশে গিয়ে, হে অমুক! আমার সফলতার জন্য দু'আ করুন। কবর থেকে উঠে ইসলামের সাহায্য করুন। কিংবা এ জাতীয় কোন বাক্য ব্যবহার করা, বা ডাকাডাকি করা মাকরূহ। আর যদি মৃতকে আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার মনে করে এভাবে বলে তবে তা হবে প্রকাশ্য গোমরাহী ও হারাম আকীদা।

–ইমদাদুল আহকাম : ১/২২৩, আইনুল হেদায়া : ১/৭২২

মাসআলা :আত্মহত্যাকারীদের রূহ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা মূল রূহের সাথে গিয়ে মিলিত হয় না মর্মে যে কথার বিশ্বাস অনেকে রেখে থাকে তার কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য আত্মহত্যা মারাত্মক অপরাধ ও গুনাহের কাজ। –আগলাতুল আওয়াম : ২৭

মাসআলা : অনেক সাধারণ মানুষ মনে করে যে, হায়েয এবং নেফাস অবস্থায় মারা গেলে দু'বার গোসল দিতে হয়। এটাও ভুল এবং ভিত্তিহীন।

–আগলাতুল আওয়াম : ৪৬

মাসআলা : অমুসলিমদের জানাযায় চোখ পড়লে فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا পড়তে হয় বলে অনেকে বিশ্বাস রাখে। এটিও ভিত্তিহীন কথা।

–আগলাতুল আওয়াম : ২১৮

মাসআলা : কবরে লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চ আওয়াযে না'ত, দরূদ শরীফ ও কালেমা পাঠ করা জায়েয নয়। তবে চুপে চুপে কালেমা শরীফ পাঠ করাতে কোন অসুবিধা নেই। –আগলাতুল আওয়াম : ২১৮

মাসআলা : অনেক সাধারণ মানুষ জানাযা নামাযের তাকবীর বলার সময় আকাশের দিকে মুখ উঠায়। এটাও ভুল এবং ভিত্তিহীন।

–আগলাতুল আওয়াম : ৪১৬

মাসআলা : জানাযা বহন করার সময় উচ্চস্বরে কালেমা পড়া বিদআত। –আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৩৮

মাসআলা : মৃতকে কবরস্থ করার সময় আযান বলা বিদআত। পূর্বসূরী ওলামাগণ থেকে এ জাতীয় কোন আমল বর্ণিত নেই।

–ফাতাওয়া দারুল উলূম কদীম : ১/১৯

মাসআলা : জানাযা নামায আদায়ের পর হাত উঠিয়ে নতুন ভাবে দু'আ করা বিদআত। এটা অবশ্য বর্জনীয়। –ইমদাদুল আহকাম : ১/১৯৫

মাসআলা : শরীয়তবিরোধী কোন কার্যকলাপ হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে বৃদ্ধাদের জন্য কবর যিয়ারত জায়েয আছে। তবে যুবতীদের না যাওয়া শ্রেয়। কারণ এতে ফিতনার আশঙ্কা থাকে।

–ইমদাদুল আহকাম : ১/৮১৩

মাসআলা : মৃতব্যক্তি ঘরে থাকুক বা মহল্লায়, সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া করা গুনাহ্ বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে তা একেবারেই ভুল এবং ভিত্তিহীন।

মাসআলা : অনেক সাধারণ মানুষ মনে করে মৃতকে তার ঘরের পাত্র দ্বারা গোসল না দিয়ে নতুন পাত্র ইত্যাদি দ্বারা গোসল দিতে হয় এবং গোসল শেষে সে সব পাত্র, প্লেট ইত্যাদি মসজিদে দান করতে হয়। এ ধারণাটিও ভুল, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। –আগলাতুল আওয়াম : ১৯৬

মাসআলা : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার স্থানে অনেকে তিনদিন পর্যন্ত চেরাগ জালায়, এটাও ভিত্তিহীন। –আগলাতুল আওয়াম : ২১৬

মাসআলা : কাফনের মধ্যে কিংবা কবরে কারো 'হলফ নামা' কোন বুযুর্গ এর শাজারা বা বংশ সূত্র, কুরআনের আয়াত কিংবা কোন দু'আ রাখা ঠিক নয়। এমনকি কাফনে বা বুকের ওপর কর্পুর বা কালি দ্বারা কালিমায়ে তাইয়্যেবা অথবা অন্য কোন দু'আ লেখাও সহীহ্ নয়।

–আগলাতুল আওয়াম : ২০৮

মাসআলা : স্বামী মারা গেলে হাতের চুড়ি না খুলে ভেঙ্গে ফেলার যে কুপ্রথা অনেক এলাকায় প্রচলিত রয়েছে তা অমুসলিমদের কুসংস্কার এবং সম্পদেরও অপচয়। তাই চুড়ি ইত্যাদি ভাঙ্গা যাবে না; বরং খুলে রেখে দিবে যাতে ইদ্দতের পর বিধবা সেই চুড়ি পরতে পারে। অবশ্য চুড়ি খুলতে গেলে যদি খুব বেশি কষ্ট হয় তাহলে বাধ্য হয়ে ভাঙতে হলে ভাঙ্গা যেতে পারে। –আগলাতুল আওয়াম : ২১৪, ইমদাদুল ফাতাওয়ার সূত্রে

মাসআলা : মৃতদের রূহ দুনিয়াতে ফিরে আসার ধারণা ভুল। কেননা নেকবান্দাহ এর রূহতো দুনিয়াতে আসতেই চাবে না। আর বদকার এর জন্য তো আসারই অনুমতি নেই।

মাসআলা : অনেক মূর্খলোক মনে করে, যে মহিলা আতুর ঘরে মারা যায় সে ভুত হয়ে যায়, এটিও ভুল আকীদা। বরং হাদীস শরীফে এসেছে উক্ত মহিলা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। –আগলাতুল আওয়াম : ১৯

মাসআলা : অনেকে বিশ্বাস করে যে, শবেবরাত ইত্যাদি রাত সমূহে মৃতদের রূহ ঘরে আসে দেখতে থাকে যে, তাদের জন্য কিছু পাকানো হয়েছে কিনা? একথা সুস্পষ্ট এ জাতীয় গোপন বিষয় কোন নকলী দলীল ছাড়া প্রমাণিত হয় না। আর এক্ষেত্রে তার তো প্রশ্নই আসে না। অতএব এটি একটি ভ্রান্ত আকীদা।

মাসআলা : অনেকে বিশ্বাস করে, প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মৃতদের রূহ নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে দেখতে থাকে তাদের জন্য কে সওয়াব পৌছায়। কিছু সওয়াব যদি তারা পেয়ে যায় তাহলে তো ভাল কথা। অন্যথায় নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। এটি একটি ভুল ও ভ্রান্ত আকীদা। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। —আগলাতুল আওয়াম : ২০

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা

মাসআলা : কবরে ওরস করা কিংবা দিনক্ষণ নির্ধারণ করে ফাতেহা পাঠের জন্য লোকজনকে দাওয়াত করা খায়রুল কুরূন তথা ইসলামের সোনালী যুগের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এটা নিষিদ্ধ বিদআত। কবর যিয়ারতের ব্যাপারে হাদীস শরীফে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এ জাতীয় কোন শর্তারোপ করা হয়নি যে, নিজ শহরেই কবর যিয়ারত করা যাবে, অন্যত্র সফর করা যাবে না। আর কবর যিয়ারতের জন্য সফর করতে নিষেধও করা হয় নি।

মাসআলা : কবর যিয়ারতের জন্য সফরের অনুমোদন এবং বৈধতা শিরক, বিদআত এবং শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকার শর্ত সাপেক্ষে কার্যকর হবে। —ফাতওয়ায়ে ওসমানী : ১/১১৫

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. তাঁর ভাই আব্দুর রহমানের কবর যিয়ারত করেছেন যা মদিনা থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। হাদীস শরীফে বাইতুলাহ শরীফ, মসজিদে নববী ও বাইতুলমুকাদ্দাস ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে।

—আবূ দাউদ, আস সুনান : ২০৩৫,
সহীহ বুখারী : ১১৮৯, সহীহ মুসলিম : ৩৪৫০

কেননা এ তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্যান্য সকল মসজিদের ফযীলত ও মর্যাদা সমান। তবে অন্য সব মসজিদের ওপর এ তিনটির শ্রেষ্ঠত্ব হাদীস

দ্বারা প্রমাণিত। অতএব সে ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে এ মসজিদ গুলোর উদ্দেশ্যে সফর করার অনুমতি রয়েছে। –ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৪/১৫৬

মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে দাওয়াত করার প্রথা

প্রশ্ন : মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে যে খাবার পাক করে লোকজনকে দাওয়াত করা হয় এবং বিবাহের অনুষ্ঠানের ন্যায় আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবরা এতে একত্রিত হয়, বিষয়টাকে সমাজে জরুরীও মনে করা হয়। এর বিধান কী?

উত্তর : প্রচলিত এ দাওয়াত প্রথা নাজায়েয এবং বিদআত। নাজায়েয ও বিদআত হওয়ার কারণ নিম্নরূপ ঃ

১. মূলত এটা হিন্দু এবং অমুসলিমদের প্রথা। এর মাধ্যমে অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

২. দুঃখ ও পেরেশানীর ক্ষেত্রে ইসলামে দাওয়াত অনুমোদিত নয়। এর বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাব সমূহে রয়েছে।

৩. এ ধরনের দাওয়াতকে আবশ্যক মনে করার ফলে অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক করে নেয়া হয়, যা জায়েয নয়।

৪. দাওয়াতে যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা হয়, তাতে নাবালেগ এবং এতীমেরও অংশ থাকে। আর নাবালেগের সম্পদ সদকা করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়।

৫. এ দাওয়াতের উদ্দেশ্য ঈসালে সওয়াব নয়; বরং লৌকিকতা প্রদর্শন কিংবা লোকজনের সমালোচনা ও নিন্দা হতে বাঁচার বিশেষ অবলম্বন যা শিরকে আসগর বা ছোট শিরক। এ দাওয়াতের উদ্দেশ্য ঈসালে সাওয়াব না হওয়ার আলামতগুলো হচ্ছে :

(ক) গোপনে সদকা করার ফযীলত অনেক বেশি যা সর্বাবস্থায় উত্তম। কিন্তু তাদেরকে গোপনে সদকা করতে উৎসাহিত করা হলে, তারা কখনো তা কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয় না।

(খ) নগদ সম্পদ, টাকা পয়সা সদকা করা অধিক উত্তম। কারণ এতে গোপনীয়তা রক্ষার পাশাপাশি দরিদ্রদের উপকার বেশী হয়। তারা তাদের

প্রয়োজন মত তৎক্ষণাত যে কোন খাতে নগদ অর্থ ব্যয় করতে পারে। তৎক্ষণাত প্রয়োজন না হলেও ভবিষ্যতের জন্য তা সংরক্ষণ করে রাখতে পারে খুব সহজে। দাওয়াতের মধ্যে এ উপকারের দিকটি নেই। এমনকি অনেক সময় তো খাবার ক্ষতিকরও হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও নগদ টাকা সদকা করার জন্য অনেকেই রাজি হয় না।

দ্বিতীয়ত : দরিদ্রদের মাঝে তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সদকা করাই হচ্ছে সদকার উত্তম পদ্ধতি ও পন্থা। অসুস্থকে ওষুধ দেয়া, মুসাফিরকে টিকেট, ভাড়া এবং রাস্তার প্রয়োজনীয় খাবার ইত্যাদি দেয়া, ক্ষুধার্থকে খাবার দেয়া, পোষাকহীনকে পোশাক, জুতা, শীত মৌসুমে অসহায়দেরকে কম্বল, লেফ ইত্যাদি দেয়া। মোট কথা দরিদ্র ও অসহায়দের প্রয়োজন অনুপাতে তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী সদকা করা অধিক উত্তম। কিন্তু উক্ত দাওয়াতে সর্বাবস্থায় খাবারই খাওয়ানো হয়। চাই অসুস্থ ব্যক্তি ওষুধের জন্য হাহাকার করুক, পোষাকবিহীন লোক শীতে কাঁপতে থাকুক কিংবা প্রচণ্ড গরমে পুড়তে থাকুক, মুসাফির গন্তব্যে পৌঁছতে অক্ষম হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকুক এসব দিকে দৃষ্টিপাত করতে তারা রাজি নয়।

দাওয়াতের পরিবর্তে যদি যার যার প্রয়োজন অনুপাতে সহযোগিতা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয় যা গরীবদের জন্য কল্যাণকর, মৃতের জন্যও অধিক উপকারী এবং মৃতের পরিবারের সদস্যদের জন্য সহজসাধ্য তবে উত্তর আসে যে দাওয়াত না করলে সামাজিক বন্ধন ঠিক থাকে না। সমাজের লোক নারাজ হবে এবং আমাদের নাক কাটা যাবে।

গ. দাওয়াত দ্বারা যদি ঈসালে সওয়াবই উদ্দেশ্য হতো, তবে অসহায় ও দরিদ্রদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে এর উল্টো অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সমাগম হয়। এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বিত্তশালীদের আমন্ত্রণ করা হয়, অথচ নামমাত্র কিছু দরিদ্রকে দাওয়াত দেয়া হয়। অনেক জায়গাতেতো নামমাত্র কোন ফকীরকেও দাওয়াত করা হয় না। এই ধরনের দাওয়াতকে ঈসালে সওয়াবের দাওয়াত বলার দুঃসাহস হয় কিভাবে?

মৃতব্যক্তির ঘরে খাবার পাঠানো

মাসআলা : মৃতের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন ও তাদের মনোতুষ্টির লক্ষ্যে মৃতের ঘরে খানা পাকিয়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা তাদেরকে নিজ ঘরে এনে খাওয়ানো বা মৃতের ঘরে খাবার পানীয় সব নিয়ে যাওয়া এমনকি তাদেরকে আরো বেশি সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তাদের সাথে একত্রে খানা খাওয়া উত্তম। এভাবে তাদের শোকের ব্যাকুলতা দূর হওয়া পর্যন্ত খাবার পাঠানোর বিষয়টি শরঈভাবে প্রমাণিত। এর অতিরিক্ত কিছু প্রমাণিত নেই। উপরন্তু মৃত ব্যক্তির ঘরে আনন্দ উৎসবের লক্ষ্যে দাওয়াত নেয়া মাকরূহ।

ফাতাওয়া শামীতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মৃতকে দাফন করার উদ্দেশ্যে বহিরাগত লোকজন ঘটনাক্রমে কিংবা মৃতের পরিবারের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাদের সাথে খানা পিনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ আছে। কিন্তু দূরদুরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজন এসে সমাজের প্রথা হিসেবে দীর্ঘ দিন অবস্থান করা, উৎসবের দাওয়াতের ন্যায় একত্রিত হওয়া মাকরূহ এবং বিদআত।

—নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১৪৭

মাসআলা : মৃতের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজন শুধু একদিন মৃতের পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবার পাঠাবে। একদিন এক রাতের জন্য যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ পাঠানো মুস্তাহাব।

একদিনের অতিরিক্ত খানা পাঠানো মাকরূহ। এই প্রথা পালন করতে গিয়ে মারাত্মক সমস্যা এবং লৌকিকতায় সীমাতিরিক্ততা ও অতিরঞ্জন ছাড়াও সাধারণ মানুষ এটাকে অবশ্য পালনীয় শরয়ী বিধান মনে করে, যা শরীয়তের মধ্যে অতিরঞ্জন এবং বিদআত তথা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয়ের অবৈধ সংযোজন।

—আহসানুল ফাতাওয়া : ১/২০৪
রদ্দুল মুহতার ১/৮৪১ এর সূত্রে

মাসআলা : মৃত ব্যক্তির ঘরে অবস্থান করলে খানা খাওয়া যাবে না মর্মে যে কথা প্রচলিত রয়েছে শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। এমনকি মৃতের পরিবারের সদস্যদের খানা বর্জন করারইতো কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই। উল্লেখ্য শোক এবং পেরেশানীর কারণে খানা খেতে না পারা ভিন্ন কথা। কিন্তু বর্তমানে এ প্রথা হয়ে গেছে যে, মৃতের ঘরে অবস্থান করা

অবস্থায় খানা বর্জন করা হয় আর খানা খাওয়াকে গুনাহ মনে করা হয়। এটি একেবারেই মনগড়া মতবাদ, যা বর্জন করা আবশ্যক। অনিচ্ছা সত্ত্বে হলেও কিছু খেয়ে নেয়া চাই। মৃতের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের দায়িত্ব হল তারা মৃতের পরিবারের সদস্যদেরকে উৎসাহ দিয়ে হলেও খানা খাওয়ানোর চেষ্টা করবে। –আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/২১৪

মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানানো

মাসআলা : মৃতের পরিবারর্গকে সমবেদনা জানানো, তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া, সন্তুষ্ট করা, ধৈর্যধারণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, তাদের এবং মৃতের জন্য দু'আর বাক্য বলা সুন্নত। এর অনেক ফযীলত রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, "যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সমবেদনা জানাবে; আল্লাহ তা'আলা বিদপগ্রস্ত ব্যক্তির সমান সওয়াব তাকে দান করবেন।"

–তিরমীযি শরীফ : ১/১২৭

মাসআলা : তিন দিন পর্যন্ত সমবেদনা জানানো যাবে এর অতিরিক্ত করা মাকরূহ। তবে যে ব্যক্তি মৃত্যুর সংবাদ বিলম্বে শুনতে পায়, কিংবা সমবেদনা জ্ঞাপনকারী বা মৃতের পরিবারের কেউ উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে তিন দিনের পরও সমবেদনা জানানো যাবে। কোন অপরাগতা কিংবা দূরত্বের কারণে উপস্থিত হতে না পারলে লিখিতভাবেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চিঠির মাধ্যমে সমবেদনা জ্ঞাপন প্রমাণিত আছে। –হিসনে হাসীন : ১৮০

মাসআলা : হাদীস শরীফে সমবেদনার বাক্য এরূপ এসেছে-"আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, এবং ধৈর্যের উত্তম বিনিময় দান করুন আর মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন।"

মাসআলা : সমবেদনা জ্ঞাপন নিছক দুনিয়াবী প্রথাই নয়, বরং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ইসলামী শিক্ষা, যা ফযীলতপূর্ণ এবং সওয়াবের কাজ।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/২৩২

মাসআলা : মৃতকে কবরস্থ করার পর ঘরের লোকজনের সাথে মুসাফাহা করা সুন্নত বিরোধী। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১/১২০, শামী : ১/৭৪২, মারাকিল ফালাহ : ১২০, আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/১৩৫

সমবেদনা অনুষ্ঠান করা

মাসআলা : কোন মুসলমানের ইন্তেকালে তার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা অর্থাৎ ধৈর্যধারণ এবং ভেঙ্গে না পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বশরীরে যাওয়া সম্ভব না হলে চিঠি পত্রের মাধ্যমে লিখিতভাবে সমবেদনা জানানো সালাফে সালেহীন গণের আমল থেকে প্রমাণিত। কারো মৃত্যুতে যদি বহুসংখ্যক লোকের কষ্ট হয় এবং সকলেই সমবেদনা জ্ঞাপন করতে চায় আর সকলের পক্ষে মৃত্যুর সময় সেখানে পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি সমবেদনামূলক অনুষ্ঠান করবে যাতে মৃতের পরিবারের উপর অতিরিক্ত মেহমানের চাপ থাকবে না। উল্লেখ্য, বড় মজলিসে দু'আ কবুল হয়। তাই শরয়ী দৃষ্টিকোণের মধ্যে কোন মন্দ দিক নেই। কিন্তু অনেক স্থানে এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রথাসর্বস্ব হয়ে গেছে। (এসব অনুষ্ঠান স্মরণসভা নামে সংঘটিত হয়), উদ্দেশ্য থাকে সংবাদ মিডিয়াগুলোতে আয়োজক ও পরিচালকদের নাম আসবে, তাদের প্রসিদ্ধি হবে। তারা আরো মনে করে, যদি এ জাতীয় অনুষ্ঠান না করা হয় লোকজন ভৎর্সনা করবে ইত্যাদি। বাস্তবেই যদি অবস্থা এমন হয় তাহলে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। —ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ২/২২৫

সীমাহীন লজ্জাহীনতা

বর্তমানে অনেকের নির্লজ্জতা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সমাজের কারো মৃত্যুর সংবাদ শুনলে তারা শকুনের মত পুলকিত হয়ে ওঠে। খানা পাওয়ার আশায় তারা আনন্দিত হয়। সাবধান! অন্তরে যদি আল্লাহ তা'আলার ভয়, পরকালের চিন্তা, এবং নিজের হিসাব নিকাশের ভয় না থাকে আর আল্লাহ তা'আলা এবং ইসলামের প্রতি লজ্জা ও ভয় নাই থাকে এতটুকু লজ্জা ও ব্যক্তিত্বতো থাকা উচিত যে, যার স্বজনের ইন্তেকাল হয়েছে সে তো কঠিন দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত। দ্বিতীয়ত: রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীর পরিবার চিকিৎসা ব্যয় দিয়ে খরচে জর্জরিত অথচ নির্লজ্জ লোকগুলো তার পরিবারের অবশিষ্ট সম্পদটুকু খেয়ে সারা করার জন্য ওৎপেতে বসে থাকে। যদি বাস্তবেই ঈসালে সাওয়াব উদ্দেশ্য হয়, বাস্তবেই যদি মৃত ব্যক্তির কল্যাণকামিতা উদ্দেশ্য হয় এবং মৃতের উপকার সাধনের জযবা

অন্তরে থেকে থাকে তাহলে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ও উপকারী অভিভাবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত পদ্ধতি আপনার জন্য যথেষ্ট হয় না কেন?

ঈসালে সাওয়াবের হাকীকতটা জেনে নিন! যেসব নেক আমল মানুষ নিজের জন্য করে থাকে সেগুলো অন্যের জন্য সওয়াব পৌছানোর নিয়তে করলে অন্যের নিকট তার সওয়াব পৌছে যায়। জীবিত এবং মৃত সকলের জন্যই ঈসালে সওয়াব করা যায়। আপনি আপনার জন্য নফল নামায পড়ুন, নফলরোযা পালন করুন, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করুন, তাসবীহ পাঠ করুন এবং দান সদকা ইত্যাদি করুন, নফল হজ ও ওমরা করুন, ইতেকাফ পালন করুন মোট কথা যত ধরনের নফল ইবাদত আপনি নিজের জন্য করে থাকেন, সেগুলোর মধ্যে শুধু নিয়তটা এভাবে করে নিন যে, হে আল্লাহ! এই আমলগুলোর সওয়াব আমার অমুক আত্নীয়কে পৌছে দিন অথবা এসব ইবাদতের সওয়াব অমুক আত্নীয়দের জন্য পৌছানোর নিয়ত টা করে নিন। এ নিয়ত করার দ্বারা আপনি যে সওয়াব পেয়েছেন যাদের উদ্দেশ্যে এসব আদায় করেছেন তারা সকলেই পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে।

এক্ষেত্রে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, ঈসালে সওয়াব শুধু মৃতদের জন্যই করা যায়, জীবিতদের জন্য করা যায় না, এটা ভুল। জেনে রাখবেন! মৃতদের জন্য যেমনিভাবে ঈসালে সওয়াব করা যায় একই পদ্ধতিতে জীবিতদের জন্যও ঈসালে সওয়াব করতে পারেন।

—ইসলাহুর রুসূম

মাসআলা : অনেকে খানা খাওয়ানোকেই সদকার একমাত্র পদ্ধতি মনে করে। অভাবীদেরকে নগদ টাকা দেয়া বা তাদেরকে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে দেয়াকে সদকা মনে করে না। এমনিভাবে অনেকে বৃহস্পতিবার রাতে মসজিদে খানা পাঠানোকে জরুরী মনে করে, অথচ সদকার জন্য বৃহস্পতিবার রাত কিংবা মসজিদ কোনটিই শর্ত নয়। আবার অনেকে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে খাবার পাঠায় আর উক্ত খাবার খাওয়ার পূর্বে ফাতেহা পাঠ করা না হলে ঈসালে সওয়াবই হয় না বলে মনে করে, এটিও ভুল। ইখলাসের সাথে আপনি আল্লাহর রাস্তায় যা কিছুই দান করেন তা কবূল হয়ে যায়। আর আপনার কোন আত্নীয় স্বজনকে সওয়াব পৌছানো উদ্দেশ্য হলে তাদের জন্য ঐ সওয়াব পৌছে যায়।

—আপকে মাসায়েল : ৩/৪৩১

ঈসালে সওয়াব এর জন্য দাওয়াত করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله

কেয়ামতের দিন যখন অন্য কোন ছায়া থাকবেনা আল্লাহ তা'আলা নিজ আরশের নিচে সাত শ্রেণীর লোককে ছায়া দান করবেন। মানুষ তাদের গুনাহের কারণে যখন ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। যার গুনাহ অধিক হবে তার ঘামও হবে অধিক। কারো টাখনু পর্যন্ত, কারো নাভী পর্যন্ত, কারো বুক পর্যন্ত, কারো ঠোট পর্যন্ত এবং অনেকের অবস্থা এত মারাত্মক হবে যে, তারা ঘামের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকবে। এ কঠিন পরিস্থিতিতে যে সাত দল আরশের ছায়া লাভে ধন্য হবেন তাদের এক দল হচ্ছে যারা অতি সঙ্গোপনে এমনভাবে সদকা করে, তাদের ডান হাত কি দিয়েছে বাম হাত সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন উক্ত ব্যক্তির এত বড় মর্যাদা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা এ গুণের কারণে কিয়ামতের বিভীষিকাময় সময়ে প্রচন্ডগরম থেকে মুক্তি দিবেন এবং আরশের ছায়া দিয়ে ধন্য করবেন।

একটু চিন্তা করুন! গোপনে সদকা করার ফযীলত কত বেশী। এর পরও আপনি কেন কারো মৃত্যুর পর ঈসালে সওয়াবের জন্য ডাকঢোল পিটিয়ে দাওয়াত নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন? এসব না করে দাওয়াতের টাকাগুলো গোপনে গরীব ও অসহায় তালেবে ইলমকে দিয়ে দিন কিংবা মহল্লার মিসকীন ও হতদরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিন। শরীয়ত সদকা করতে নিষেধ করেনি; বরং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছে। বেশি বেশি সদকা করুন, তবে তা করতে হবে সুন্নত পদ্ধতিতে। কিন্তু ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দাওয়াত না খাওয়ালে নাক কাটা যাবে বা সমাজে হেয় হতে হবে এগুলো ভিত্তিহীন এবং গুনাহের কথা। কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এসব কথার জওয়াব দিয়ে পার পাওয়া যাবে? সেদিন তো জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর হিসাব পেশ করতে হবে। সেখানে কেউ কারো উপকারে আসবে না, এই সমাজব্যবস্থা সেদিন আপনার কোন কাজে আসবে কি? গোপনে সদকা করার এত ফযীলত হওয়া সত্ত্বেও আপনি এখনও কি বলবেন যে, দাওয়াতই খাওয়াতে হবে? (আল্লাহ পাক সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!)

খানার পূর্বে ঈসালে সওয়াব করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে খানা পাক করে গরীব মিসকীনদের সামনে রেখে একবার সূরা ফাতেহা, তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে মৃত ব্যক্তির নামে বখশে দিয়ে এর পর খানা খাওয়া হয়। এর শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে খানার পূর্বে সূরা ফাতেহা পড়া শরয়ীভাবে প্রমাণিত নয়; বরং বিদআত। এর প্রমাণ হিসেব যে হাদীস পেশ করা হয় তা জাল। –ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৩/১৯৪

মাসআলা : মৃত ব্যক্তিকে সওয়াব পৌছানোর নিয়ত করার দ্বারা প্রত্যেক আমলের সওয়াব পৌছে যায়। কিন্তু খানা সামনে নিয়ে ফাতেহা পাঠ করে ঈসালে সওয়াব করা এবং এভাবে না করলে সওয়াব পৌছেনা বলে মনে করা ভুল। এর পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। অতএব তা অবশ্যই বর্জনীয়। –ফাতাওয়া মাহমুদিয়া : ১/২২৯

মাসআলা : পরিবারের কারো মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত রুটি খাওয়াকে জরুরী মনে করা বিদআত। এমনিভাবে একাদশ দিনকে ঈসালে সাওয়াবের জন্য জরুরী মনে করাও বিদআত। বরং কোন ধরনের দিন তারিখ নির্ধারণ না করেই শর্তহীনভাবে ঈসালে সওয়াব করা উত্তম।

–ফাতাওয়া রশীদিয়া : ১৬১

মাসআলা : খানা সামনে নিয়ে ঈসালে সওয়াব করার প্রথা একেবারে ভিত্তিহীন। (তবে এভাবে পড়ার দ্বারা উক্ত খাবার খাওয়া হারাম হয় না) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কারো থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এটি আবিষ্কৃত কুসংস্কার ও বিদআত।

বিষয়টি বোধগম্য করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যদি এটি সওয়াবের কাজই হত; তবে নেক কাজের প্রতি অধিক আগ্রহী এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা সাহাবায়ে কেরামগণ রাযি. কখনই তা ছাড়তেন না। অথচ তাঁদের কারো থেকেই এটির প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এটা বিদআত ও পথ ভ্রষ্টতা। –ইমদাদুল মুফতীন : ১/১০, কেফায়াতুল মুফতী : ১/২১০

কবর যিয়ারত এবং ঈসালে সওয়াবের সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন ১ : কবরে গিয়ে যে ঈসালে সওয়াব করা হয় তার সুন্নত পদ্ধতি কী?

প্রশ্ন ২ : কবরে গিয়েই ঈসালে সওয়াব করা আবশ্যক? ঘরে বসে ঈসালে সওয়াব করলে উক্ত সওয়াব পৌছবে কি না?

উত্তর ১ : ঈসালে সওয়াবের সঠিক এবং সুন্নত তরীকা হচ্ছে কবরস্থানে গিয়ে এই দু'আ পড়বে-

السلام عليكم يا اهل الديار من المومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات !انتم لنا سلف ونحن بالاثر يغفر الله لنا ولكم اجمعين.

এর মাধ্যমে করবাসীদেরকে সালাম করা হয়, সালামের পর ১ বার সূরা তাকাসুর, ১১ বার সূরা ইখলাস এবং সুযোগ হলে একবার সূরা ইয়াসিন পড়বে, এরপর আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করবে আয় আল্লাহ! এই তিলাওয়াতের সওয়াব অমুক অমুককে এবং এই কবরস্থানে শায়িত সকল মুসলমানকে পৌছে দিন।

উত্তর ২ : ঘরে বসেই কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও নফল আমল করে মৃতদের জন্য ঈসালে সওয়াব করা যায়। ঈসালে সওয়াবই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে উক্ত উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে কবরে যাওয়ার দ্বারা মৃতের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন উদ্দেশ্য হলে কবরে যাওয়া উত্তম কারণ কবরে গিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার দ্বারা মৃতব্যক্তি অত্যধিক আনন্দিত ও খুশি হন। –ইমদাদুল আহকাম : ১/১৯৩

বিদআত এর সংজ্ঞা

মাসআলা : আল্লাহ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা এবং স্বাধীনতায় অন্য কাউকে সমকক্ষ মনে করা শিরক। আর যেসব কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনগণ কেউ-ই করেন নি; বরং দ্বীনের নামে পরবর্তীতে আবিস্কার করা হয়েছে, ইবাদত মনে করে তা করাই হচ্ছে বিদআত। এই মূলনীতির আলোকে এর উদাহরণ বেরিয়ে আসে :

মাসআলা : আদদুররুল মুখতার ফাতাওয়া শামী সংযুক্ত-১/১৬০ বিদআতের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তার সার নির্যাস হচ্ছে-

(ক) দ্বীনের মধ্যে এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি এবং কাজকর্ম আবিষ্কার করা যে পদ্ধতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে না মৌখিকভাবে প্রমাণিত আছে না কর্মগতভাবে, আর না আছে সমর্থনগতভাবে প্রমাণিত। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই যা প্রমাণিত নেই। তা-ই বিদআত।

(খ) বিদআতকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধীতার উদ্দেশ্যে হঠকারিতামূলক বিদআতে লিপ্ত হয় না; বরং একে ভাল এবং নেক কাজ মনে করেই করে থাকে।

(গ) আবিস্কৃত বিষয়টি দ্বীনের কোন উদ্দেশ্যের জন্য মাধ্যম হয় না; বরং এটাকে দ্বীনের জরুরী বিষয় মনে করে করা হয়।

–আপকে মাসায়েল ১/৪৫, নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১২১
ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৩৩৮

মাসআলা : কুফর এবং শিরক এর পর বিদআত অনেক বড় গুনাহ। আর যে সব বিষয় শরীয়তে প্রমাণিত নয় অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ থেকে যার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবয়ে তাবেঈনদের যুগে যার কোন অস্তিত্ব ছিলনা, পরবর্তীতে দ্বীন হিসেবে তা আবিস্কার করত: তদানুযায়ী আমল করাই হচ্ছে বিদআত।

মাসআলা : বিদআত একেবারেই ঘৃণ্য ও নিকৃষ্টতম গুনাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদআতকে পরিত্যাজ্য বলেছেন। আর বিদআতের আবিস্কারককে দ্বীনের ধ্বংসকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار –তিরমিযী

অর্থাৎ, সকল বিদআতই গোমরাহী, আর সকল গোমরাহীর ঠিকানা জাহান্নাম। –তা'লীমুল ইসলাম : ৪/২২

বিদআতের প্রকারভেদ

প্রশ্ন : বিদআতের কোন প্রকার হাসানা বা উত্তম আছে কি না?

উত্তর : বিদআত কোনটাই হাসানা বা উত্তম নয়। তবে বিদআতে হাসানা বলে যা বুঝানো হয় তা মূলতঃ সুন্নত। পরিভাষাগত পার্থক্য থাকলে ও উদ্দেশ্য একই। —ফাতাওয়া রাশীদিয়া : ১৪৬

সুন্নত এর আভিধানিক অর্থ পথ ও পন্থা। চাই তা ভাল হোক বা মন্দ আর বিদআত অর্থ নতুন আবিস্কার; যা পূর্বে ছিলনা। অভিধানে যে কোন নতুন আবিস্কৃত বস্তুকে বিদআত বলা হয়। এই সংজ্ঞা হিসেবে বিদআত সর্বদা মন্দ ও ভ্রষ্টতাই হয়ে থাকে। অবশ্য শাব্দিক অর্থ হিসেবে কখনো তা উত্তম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। —নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১২১

মাসআলা : হাদীস শরীফে যে বিদআত এর ব্যাপারে ধমকী এসেছে এবং যার নিকৃষ্টতার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা একটিই। তা হচ্ছে-

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

মাসআলা : যেমনিভাবে শিরক এর বিপরীত হচ্ছে তাওহীদ, তদ্রূপ বিদআত হচ্ছে সুন্নত এর বিপরীত। বিদআত সুন্নতকে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সুন্নতকে ধ্বংস করে, অনেক ক্ষেত্রে সুন্নত এর জায়গা দখল করে নেয়। —ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৩৩৭

মাসআলা : মসজিদে নববীতে তারাবীহ নামায একই জামাতভুক্ত হওয়ার দৃশ্য দেখে হযরত উমর রাযি. বলেন,

"نعمت البدعة هذه"

কতইনা উত্তম আবিস্কার।

একারণেই মূলত : বিদআতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় (১) বিদআতে হাসানা এবং (২) বিদআতে সাইয়েআহ।

নতুবা বিদআতে হাসানাহ শুধু শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিদআত, পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। كل بدعة ضلالة দ্বারা ভ্রান্ত এবং নিকৃষ্ট বিদআত উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে বিদআতে হাসানা দ্বারা যা বুঝানো হয় ত ভ্রান্তি ও গোমরাহী নয়; বরং শরীয়তের অনুসৃত পন্থা, যা দ্বীনের জন সহায়ক। অর্থাৎ তা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন নয়, বরং দ্বীনের জন্য ও দ্বীনের পক্ষে নতুন আবিস্কার। —ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১২/১৮৫

বিদআত সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য

তিরমিযী শরীফ : ১/৩৩, নাসাঈ শরীফ : ১/১৩২, মুসলিম শরীফ : ১/২৪৯, মিশকাত শরীফ : ১/২৩৮, আল বারাহীনুল ক্বতিআহ, ফাতহুল বারী : ৪/২৮৭, আততারগীব ও য়াততারহীব : ৬৫, ইখতিলাফে উম্মত আতর সিরাতে মুসতাকীম : ১০০।

বিদআত এর সূচনা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত ও অনুগ্রহ পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্ম মনোনীত করলাম। –সূরা আল মায়েদাহ: ৩

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহগণের ওপর তাঁর দেয়া সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান নিয়ামত এর উল্লেখ করে বলেন- আমি তোমাদের দ্বীনকে সার্বিক দিক থেকে সর্বগুণে গুণান্বিত করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পূর্ণতা দান করলাম। এই দ্বীন ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজনও নেই। আর শেষ নবী (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন নবীরও প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাঁকে মানব ও দানব উভয় জাতির নবী বানিয়েছেন, তিনি যা হালাল বলেছেন, তাই হালাল, আর যা তিনি হারাম করেছেন তা-ই হারাম। দ্বীন যে জীবন বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাই দ্বীন। দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেয়া বান্দাহদের ওপর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত পূর্ণ করা। কেননা আল্লাহ নিজেই দ্বীন ইসলামের ওপর সন্তুষ্ট, তাই তোমরাও এর প্রতি সন্তুষ্ট হও। এই দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর নিকট একমাত্র প্রিয় ও পছন্দনীয় দ্বীন।

এই দ্বীন দান করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফযল ও অনুগ্রহে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানবজাতির কল্যাণার্থে প্রেরণ করেন এবং মহা পবিত্র ও মহাসম্মানিত কিতাব কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, "ইসলাম ধর্মকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, অতএব কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে কোনরূপ বাড়ানো বা কমানোর প্রয়োজন পড়বে না। আল্লাহ তা'আলাই এ দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করেছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এতে কোন ত্রুটি দেখা দিবে না। আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি কখনোই এর ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না।"

তাফসীরে ইবনে কাসীর সূরা মায়েদার প্রথম রুকুর তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম এর সূত্রে বর্ণিত, এক ব্যক্তি দ্বীনের একনিষ্ঠ আনুসারী ছিলেন। কিছু সময় পর শয়তান তাকে এ বলে প্রতারণা দিল যে, পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া নিয়ম নীতি অনুসরণ করে চলছো। এতে কী রয়েছে? এভাবে সাধারণের নিকট তোমার কোন গুরুত্ব ও মূল্যায়ন হবে না এবং তোমার কোন প্রসিদ্ধিও হবে না। তাই তোমাকে নতুন কিছু আবিস্কার করতে হবে। জনসাধারণের মাঝে তা প্রচার প্রসার ঘটাতে হবে, তাহলে দেখবে সর্ব সাধারণের নিকট তুমি কীভাবে প্রসিদ্ধি লাভ কর, আর বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে তোমার আলোচনা কীভাবে হতে থাকে। পরামর্শ, অনুযায়ী লোকটি তাই করে বসল।

তার এসব নব আবিস্কৃত কথাবার্তা সমাজে প্রসারতা লাভ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মানুষ তার অনুসরণ করতে শুরু করে। পরবর্তীতে লোকটি খুব লজ্জিত হয়ে ওই দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় এবং নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসে "তুমি একাই গুনাহ করতে আর শুধু তোমার একার গুনাহই হত, তবে আমি তা ক্ষমা করতাম, কিন্তু তুমিতো সাধারণ মানুষদেরকে গোমরাহ করে দিয়েছ, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছ, আর সেই ভ্রষ্টতার ওপরই তাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের গুনাহের বোঝা তোমার থেকে হটাবে কীভাবে? আমি তোমার তওবা কবুল করব না"।

–তাফসীরে ইবনে কাসীর পারা : ৬/১২৫, সূরা মায়েদাহ

হাদীস : হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ দ্বীনের মধ্যে কোনো নতুন বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটায়, যা এর মধ্যে নেই তা পরিত্যাজ্য।

–সহীহ মুসলিম : ২/২৫; হাদীস নং : ১৮১, মিশকাত শরীফ : ১/১০৫; হাদীস নং : ১৩১, মাযাহেরে হক : ১/৬৮

হাদীস : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআত আবিস্কার করবে, কিংবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দিবে, তার ওপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত, সমস্ত ফেরেস্তা এবং সকল মানুষের লা'নত বর্ষিত হোক। তার কোন নফল ও ফরয ইবাদতই গ্রহণযোগ্য হবে না। —সহীহ বুখারী : ২/১১৫, হাদীস : ৪১৩

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আজ ভারতবর্ষে বিদআতের প্রচলন ঘটে গেছে ব্যাপকভাবে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যারা বিদআত থেকে বহু দূরে থাকে আজ তাদেরকে মুসলমানই মনে করা হয় না। বরং তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে বলে মনে করে। আপনিই একটু চিন্তা করুন : আমাদের সমাজের অধিকাংশ মূর্খ এবং অশিক্ষিত মুসলমানের অন্তরে এসব বিদআত কত দৃঢ়ভাবে বাসা বেঁধে নিয়েছে যে, কোন একটা বিদআত ছেড়ে দেয়া তাদের নিকট মাযহাব ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে কঠিন মনে হয়। আর এসব ক্ষেত্রে পেট ও পকেট পুজারী কিছু মৌলভী ও পীরদের ভূমিকাও নিন্দনীয়। তাদের অধিকাংশই স্বল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর এর শ্রেণীভুক্ত । কদাচিৎ ইলম থাকলেও কুপ্রবৃত্তির নিকট পরাজিত তারা। ফলে মূর্খ লোকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অপব্যাখ্যা করে ফাতওয়া চালিয়ে দেয়। আর এটাকেই দ্বীন মনে করে মূর্খ লোকগুলো এর ওপর আমল শুরু করে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই একে অন্যের দেখা দেখি এসব বিষয়ের ওপর আমল করে থাকে। কারণ সকলেই করতে থাকলে দু'একজন না করলে সকলের পক্ষ থেকে তার ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। এমনকি তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করারও ধমকী দেয়া হয়।

(সংকলক বলেন) স্বয়ং আমার সাথেও এমন আচরণ করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাকে হেফাযত করেছেন| (الحمد لله)

দেখুন : মূর্খতা কী পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে। ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নত পালনের ব্যাপারে কারো ওপর কোন ধরনের চাপ নেই, নেই কোন ধমকীর বাণী, সমাজ থেকে কাউকে বয়কট করা হয় না, অথচ বিদআত-যা শরীয়তে ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট এবং যার ব্যাপারে কঠিন ধমকী রয়েছে এর জন্য ঝগড়া বিবাদ হয় না এমন এলাকা ও পাড়া-মহল্লা পাওয়াই যাবে না।

হাদীস : হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "বিদআতীর নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, ওমরা, জিহাদ, সদকা, ফিদইয়াসহ কোন ইবাদতই আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। বরং ইসলাম থেকে সে এরূপভাবে বের হয়ে যায় যেমনি ভাবে আটা থেকে চুল বের করে নেয়া হয়।" (অর্থাৎ ইসলামে তার কোন অংশই থাকে না)। –ইবনে মাজাহ শরীফ : ৪০, হাদীস : ৫১

বিদআত জলাতঙ্কের মত

বিদআতীর অবস্থা জলাতংক রোগীর ন্যায়। জলাতংক রোগীর শিরা-উপশিরায় যেভাবে এ রোগের জীবানু অনুপ্রবেশ করে, তদ্রূপ বিদআতীর আকীদা বিশ্বাস, ক্রিয়া কর্ম সবগুলোতেই বিদআতের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া অনুপ্রবেশ করে। –মাযাহেরে হক : ১/৭৯

কুকুর যখন পাগল হয় এবং উম্মাদনা তার শিরা উপশিরায় অনুপ্রবেশ করে, তখন পানি দেখলেই সে পালাতে থাকে। পানি পান করাতো দূরের কথা, পানি দেখতেও সে পছন্দ করে না। এমনিভাবে মানুষের মধ্যে যার শিরা উপশিরায় বিদআতের জীবানু অনুপ্রবেশ করে, সে কুরআন-হাদীস শুনামাত্রই পালাতে থাকে। কুরআন-হাদীস এর উপর আমল করাতো দূরের কথা তা শুনাও তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। যেমনিভাবে পাগলা কুকুরের ভাগ্যে পানি জুটেনা, তৃষ্ণার্ত অবস্থায়ই মরে যায়, তদ্রূপ বিদআতীরও ভাগ্যে তওবা জুটে না, বরং গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট অবস্থায়-ই মৃত্যুবরণ করে। শরীয়তের কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন বিয়ষকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করাকে বিদআত বলে। বিদআত জগন্যতম গুনাহ। কেননা বিদআতী আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। কারণ শরীয়ত আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত, তাই এতে কোন ধরনের সংযোজন ও বিয়োজন করার অধিকার কারো নেই।

অতএব যে ব্যক্তি শরীয়তে এমন বিষয়ের আবিস্কার করে যা শরীয়তে ছিল না, উক্ত ব্যক্তি যেন এ শরীয়তকে ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মনে করে নিজের পক্ষ থেকে নতুন শরীয়ত বানিয়ে নিল। ফলে তার এই নতুন সৃষ্ট বিষয়ের ওপর আমল করার জন্য লোকদেরকে আহবান করে কেমন যেন সে আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও

নিজেদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত এবং প্রেমিক হিসেবে মনে করে; বাস্তবে এ ধরনের লোক মারাত্মক পথভ্রষ্ট। এদের ওপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

বিদআতীর ভাগ্যে তওবা জুটেনা

যে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হয় তার ব্যাপারে এ আশা করা যায় যে সে তওবা করবে, কোন ব্যক্তি যদি নামায না পড়ে, রোযা না রাখে, মদ পান করে, জুয়া খেলে কিংবা চুরি করে, মোটকথা যত গুনাহই করুক; যে কোনো সময় তার তওবা করার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সে গুনাহকে গুনাহ মনে করেই করে থাকে। পক্ষান্তরে বিদআতীর ভাগ্যে তওবা জুটে না। কারণ সে বিদআতকে ইবাদত মনে করে এবং এটাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ওলি আল্লাহদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পথ মনে করে। বিদআতী নিজেকে গুনাহগার মনে করে না। তাই তাদের তওবা ভাগ্যে জুটে না।

الاماشاء الله অধিকাংশ লোককে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা এবং সম্মান প্রদর্শন মনে করে নানা বিদআতে জড়িয়ে পড়ে। আবার অনেকে অলি আল্লাহদের সম্মান প্রদর্শন মনে করেও বিদআত করে। এ জাতীয় ভ্রান্তির বিষয়ে তাদেরকে বুঝানো হলে তাদের আবিস্কৃত বিদআত বিরোধী হওয়ার কারণে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য ও বাস্তব কথাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে বসে।

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে যে কোন কাজ করার পূর্বে কুরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনের কষ্টি পাথর দ্বারা তা যাচাই করে নেয়া। এ সকল উৎস থেকে কোন দলীল ও প্রমাণ পাওয়া গেলে তা পালন করবে, অন্যথায় বর্জন করবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যে কাজ করেন নি, তা যদি আমরা না করি তাহলে কেন করিনি এ ব্যাপারে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না। কিন্তু সওয়াবের উদ্দেশ্যে যদি আমরা এগুলো করি, আর হাশরের মাঠে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কেন করেছো? তাহলে জবাব দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আমার ভাইয়েরা! ভালভাবে বুঝে নিন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ করেননি, আর তা করার জন্য আদেশও করেননি, অদ্রূপ সাহাবায়ে কেরামও যা করেননি, এজাতীয় কাজ দ্বীন মনে করে করার দ্বারা এটাই বুঝে আসে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এই ক্রটি খুজে বের করা যে আমরা যা পালন করি তাঁরা সে বিষয়টি বুঝেন নি। নাউযুবিলাহ।

পক্ষান্তরে হাশরের ময়দানে যেসব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই করা হবে না, সে গুলোতে জড়াবেন না; বরং যে সব বিষয় সম্পর্কে হাশরের ময়দানে প্রশ্ন করা হবে, সে গুলোর ওপর বিশেষভাবে আমল করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং সকল মুসলমানকে বিদআত থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

ইমাম গাযযালী রহ. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে যে বিষয়টি প্রমাণিত নেই; সেই নতুন আবিস্কৃত বিষয়ে কোন যুগের সকল মানুষের ঐকমত্য হওয়ার দ্বারা তুমি প্রতারিত হবে না। আর তুমি পূর্বসূরী ওলামাদের এ পদ্ধতিটা দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধর, আল্লাহ তা'আলা তোমার সাহায্য করবেন। —ফাতাওয়া আলমগীরী : ১/১০৭, ভূমিকা অংশ

✪ প্রিয় বন্ধু! বিদআত কাকে বলে? এ বিষয়টি অধিকাংশ লোকই বুঝে না। এদিকে শয়তান তাদের অন্তরে এ প্রতারণামূলক যুক্তি ঢেলে দিয়েছে যে, কুরআন শরীফের তরজমা, হাদীস এবং ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবসমূহ, মাদরাসা এবং মসজিদ সমূহে মুসলমানদের জন্য সবধরনের ব্যবস্থাপনা এসব বিদআত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এগুলো ছিলো নাকি? তারপরও এগুলোর ওপর আমল কর কেন? এটা হলো শয়তানি প্রতারণা ও কুধারণা যা অনেকের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে। খেয়াল করে শুনো! এসব বিষয় দ্বীন পরিচালনা ও সংরক্ষণের জন্য উপায় উপকরণ এবং সহায় ও মাধ্যম যা আমল নয়। আমল এক জিনিস আর ইন্তেযাম বা পরিচলানা অন্য জিনিস। আমলের মধ্যে যদি কিছু বাড়ানো হয় তবে তা বিদআত এবং তার ওপর আমল করা নিষিদ্ধ।

যদি এ জাতীয় বিদআত থেকে বারণ করানোর জন্য বুঝানো হয়, তাহলে জবাবে বলা হয়, এগুলোতে সমস্যা কী? এগুলোতো ভাল কাজ, কোথায় নিষেধ লিখা হয়েছে?

এর উত্তর শুনে নাও! উদাহরণ স্বরূপ : কালেমায়ে তাইয়্যেবা অনেক উত্তম কাজ সকলেই এটা পছন্দ করে থাকে। পৃথিবীর কোন মুসলমান এমন পাওয়া যাবে না যে কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে ভালবাসে না এবং আন্তরিকভাবে কালেমার বরকত পেতে চায়না এমন কেউ নেই। এই কালেমাই হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি, এটি জান্নাতের চাবি। কিন্তু আযানের শেষ বাক্য لا اله الا الله যখন আসে, কেউ যদি মুহাব্বত ও ভালবাসায় অনুরক্ত হয়ে এর সাথে محمد رسول الله অংশটুকুও মিলিয়ে নেয় তাহলে কোন সমস্যা বা গুনাহ আছে কি? তারপরও মিলাওনা কেন? কেউ যদি মিলায়ে নেয় তাহলে পূর্ণ কালিমায়ে তাইয়্যেবা হয়ে যাবে, আর এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞাও লেখা হয় নি। তারপরও কেন পড় না? কালেমা তাইয়্যেবা দ্বীনের বুনিয়াদ এবং এত ফযীলতপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আযানের মধ্যে তা না পড়ার দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয় যে, এটা হচ্ছে আমল, আর আমলের মধ্যে কোন সংযোজন-বিয়োজন চলে না।

দ্বীনের মধ্যে কোন ঝগড়া নেই। কুসংস্কার এবং বিদআত ঝগড়া ফাসাদে পূর্ণ থাকে। দ্বীন গোটা বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য সার্বজনীন হবে। যেমন : খতনা করা সুন্নত। গোটা পৃথিবীর সকল মুসলমান পুরুষদের জন্যই এটা সুন্নত। এবিষয়ে কোন দেশ বা অঞ্চলের জন্য ভিন্ন বিধান কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে কুসংস্কার বিভিন্ন আকৃতি এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ পায়। কখনো কখনো এসব বিদআতের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে থাকে।

কোন বিষয়ে সুন্নত বা বিদআত এর মাঝে সংশয় সৃষ্টি হলে

সুন্নতের ওপর আমল করা এবং বিদআতকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাই হচ্ছে সৌভাগ্যের বিষয়। আর যে বিষয়ে সুন্নত বিদআত কোনটা নিশ্চিত হওয়া না যাবে অর্থাৎ কোন সন্দেহ দেখা দিবে ঐ কাজটাও বর্জন করতে হবে। উসূলে ফিকহের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে

وما تردد بين البدعة والسنة يترك, لان ترك البدعة لازم

অর্থাৎ, কোন কাজ বিদআত বা সুন্নত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে, তাও বর্জন করতে হবে, কেননা বিদআত বর্জন করা আবশ্যক।

–ফাতহুল কাদীর : ১/৪৫৫, সিজদায়ে সাহু অধ্যায়।

ان الحكم اذا تردد بين سنة و بدعة كان ترك البدعة راجحا على فعل السنة.

যখন কোন বিধান সুন্নত বা বিদআত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে সুন্নত পালন করার চেয়ে বিদআত বর্জন প্রাধান্য পায়।

–আল বাহরুর রায়েক : ৩/৩০, আরো বিস্তারিত দ্রষ্টব্য-ফাতাওয়া আলমগীরী : ১/১৭৯, ফাতাওয়া শামী : ১/৬০০

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, কোন কাজ অন্তরে ভাল বলে মনে হলে তা সুন্নত মোতাবেক কিনা এ বিষয়টি যাচাই বাছাই করা ছাড়াই তার ওপর আমল শুরু করা যাবে না; হযরত সুলাইমান দারানী রহ. বলেন-

لا ينبغى لمن الهم شيئا من الخيرات يعمل به حتى يسمع به فى الاثر

فيحمد لله تعالى اذا وافق السنة.

কারো অন্তরে যদি কোনো ভাল কাজ উদিত হয়, ঐ কাজটি সুন্নাত সম্মত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য এর ওপর আমল করার অনুমতি নেই। যদি হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে অন্তরে জাগ্রত বিষয় হাদীস সম্মত হওয়ায় আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

–ইহইয়াউল উলূম : ১/৮৬, মাযাকুল আরেফীন : ১/৯৩

সুন্নাত এর পরিচয়

মাসআলা : কোন কাজকে সুন্নত বলা হলে বিষয়টিকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তার দিকে সম্পৃক্ত করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেন নি এমন কোন কাজকে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নেই। তদ্রূপ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজের প্রতি উম্মতকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ প্রদান করেননি কিংবা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণও তার উপর আমল করেননি এ জাতীয় বিষয়কেও সুন্নাত বলা না জায়েয।

–আপকে মাসায়েল : ১/৩২৩

মাসআলা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত ও গৃহীত পদ্ধতিই হচ্ছে সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সুন্নত নিয়ে ঠাট্টা ও বিদ্রুপকারী কাফের। কোন মুসলমান এমনটি করলে মুরতাদ হয়ে যাবে। –আপকে মাসায়েল : ১/৫১

ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব এর পরিচয়

১. **ফরয :** ফরয বলা হয় ঐ সব বিধানকে যেগুলো অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, যার মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ সংশয় থাকে না, যেমন: কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া। কোন ধরনের ওযর ব্যতীত ফরয বিধান ত্যাগকারী ফাসেক এবং শাস্তিযোগ্য হবে। আর ফরয এর অস্বীকারকারী কাফের।

ফরয দু'প্রকার :

(ক) ফরযে আইন : যা পালন করা সকলের (মুকাল্লাফ) ওপর আবশ্যক। যেমন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমাযানের রোযা ইত্যাদি।

(খ) ফরযে কিফায়াহ : যা পালন করা সকলের ওপর আবশ্যক নয়, বরং কিছু সংখ্যকের আদায়ের মাধ্যমে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। আর কেউ আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হয়। যেমন : জানাযা নামায। –আদ্দুররুল মুখতার

২. **ওয়াজিব :** যে সব বিধান 'দলীলে যন্নী' বা ধারণামূলক দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাকে ওয়াজিব বলে। ওয়াজিব বর্জনকারী শাস্তিযোগ্য হয়, আর অস্বীকারকারী ফাসেক বা পাপাচারী সাব্যস্ত হয়, কাফের হয় না।

৩. **সুন্নত :** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ রাযি. যা করেছেন এবং অন্যদেরকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন তাকেই সুন্নত বলে।

সুন্নত দু'প্রকার : ক. সুন্নতে মুআক্কাদাহ **খ.** সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ

ক. সুন্নতে মুআক্কাদাহ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ রাযি. যা সর্বদা করেছেন, কিংবা করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিনা প্রয়োজনে ছাড়েন নি তাকেই সুন্নতে মুআক্কাদাহ বলে। এর বিধান আমলী দিক থেকে ওয়াজিব পর্যায়ের। অর্থাৎ বিনা ওযরে তা পরিত্যাগকারী গুনাহগার হবে, আর সর্বদা তা বর্জনকারীও গুনাহগার এবং ফাসেক বলে সাব্যস্ত হবে।

এমন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। –আদ্দুররুল মুখতার : ৫/২৯৫

এ প্রকারের সুন্নত আবার দু'প্রকার-

(১) সুন্নতে আইন : যা প্রত্যেক মুকালাফ এর ওপর সুন্নত। যেমন : তারাবীহ্ নামায ইত্যাদি।

(২) সুন্নতে কেফায়াহ্ : যা আদায় করা সকলের ওপর জরুরী নয়; বরং কিছু সংখ্যক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় কিন্তু কেউ আদায় না করলে সকলেই গুনাহ্গার হয়। যেমন : রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ই'তিকাফ করা। —ফাতাওয়া শামী : ১/৫০২

খ. সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ্ : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময় যা করেছেন, তবে কখনো বিনা ওযরে তা পরিত্যাগও করেছেন। এ প্রকারের সুন্নত পালনের মধ্যে রয়েছে প্রচুর সওয়াব, আর পরিত্যাগ করলেও গুনাহ নেই। এটাকে সুন্নতে যাওয়ায়েদ বা সুন্নতে আদিয়াহও বলা হয়।

—ফাতাওয়া শামী : ১-৯৫

৩. মুস্তাহাব : যেসব কাজ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ মাঝে মাঝে করেছেন এবং পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম পছন্দ করেছেন। —ফাতাওয়া শামী : ১/১৫৫

এর বিধান হচ্ছে এসব আমল করলে সওয়াব পাওয়া যায়, না করলে কোন গুনাহ্ নেই। এটাকে নফল, মানদূব এবং তাতা'উ ও বলা হয়।

—ফাতাওয়া শামী : ১/৯৫

৪. হারাম : দলীলে কতয়ী তথা অকাট্য ও শক্তিশালী দলীল দ্বারা যার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত তা হারাম। হারামের অস্বীকারকারী কাফের। বিনা ওযরে তা করা পাপাচারিতা এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৫. মাকরূহে তাহরীমী : দলীলে যন্নী দ্বারা যার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত তা মাকরূহে তাহরীমী। বিনা ওযরে তা করার দ্বারা গুনাহগার এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়ে যায়। এর অস্বীকারকারী ফাসেক। —শামী : ৫/২৯৪

৬. মাকরূহে তানযীহী : যা বর্জন করলে পূণ্য লাভ করা যায়। কিন্তু করলে কোন গোনাহ্ না হলেও তা করা অপছন্দনীয়।

৭. মুবাহ্ : যা করলে সওয়াবও নেই অবার না করলে গুনাহ বা শাস্তিও নেই। —ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৪১২

বরকতময় রাত সমূহে মসজিদে সমবেত হওয়া

প্রশ্ন : দুই ঈদের রাত, শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত, রমাযানের শেষ দশকের রাতসহ অন্যান্য বরকতপূর্ণ রাত সমূহে সমবেত হয়ে যিকির আযকার ও তিলাওয়াত করার এবং কোন কোন মসজিদে ওয়ায নসীহত করার যে প্রচলন রয়েছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর ঃ এসব বরকতপূর্ণ রাতে মসজিদে এসে ইবাদত করার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে ঃ

১. মসজিদে এসে ইবাদত করা জরুরী মনে না করে স্বাভাবিকভাবে মসজিদে এসে তিলাওয়াত, যিকির আযকার ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যদিও নফল ইবাদত নিজ নিজ ঘরে করাই উত্তম এবং অধিক সওয়াবের কাজ। এমনকি বায়তুলাহ শরীফ ও মসজিদে নববীর তুলনায় ঘরে নফল ইবাদতের সওয়াব বেশি।

২. মসজিদে আসা জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করা বিদআত। কারণ নফলের জন্য মসজিদে যাওয়াকে আবশ্যক মনে করার অর্থ দাঁড়ায় মসজিদে নফল ইবাদত করলে এর সওয়াব বেশি পাওয়া যায়; যা শরীয়তের মধ্যে বাড়াবাড়ি। এমনকি এটা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়ার শামিল। কেননা নফল নামায ঘরে পড়ার ক্ষেত্রে সাওয়াবের আধিক্যতার বিষয়ে বহু হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে।

৩. বরকতপূর্ণ রাতসমূহে সম্মিলিতভাবে মসজিদে গিয়ে ইবাদত করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া। যেমন : নফল নামাযের জামাত করা, ওয়ায নসীহত করা ইত্যাদি। এ পদ্ধতিও বিদআত। দ্বিতীয় পদ্ধতি থেকে এটা আরো জঘন্য ও নিকৃষ্ট। এতে দ্বিতীয় প্রকারে বর্ণিত খারাপ বিষয়গুলোর পাশাপাশি নফল নামাযের জন্য সম্মিলিত জামাত পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয় যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

অনেকে বলে থাকেন যে, ঘরে শোরগোল থাকে, বাচ্চারা কান্না কাটি করে তাই ঘরে ইবাদত করলে একাগ্রতা ও খুশুখুযু অর্জন করা যায় না।

এটি শয়তানের ধোঁকা। বাস্তবতা হচ্ছে এসব ক্ষেত্রেও একাগ্রতা ও খুশুখুযু অর্জিত হয়। তা না করে সুন্নত বিরোধী পদ্ধতিতে লক্ষবার উহ আহ, রোনাযারী এবং একাগ্রতার ভান করা হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে 'খুশূ'-বলা হবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একান্ত অপারগতা সত্ত্বেও তাহাজ্জুদ ও নফল ইত্যাদি ঘরেই আদায় করতেন। আর ঘরে নফল পড়ার মাঝেই অধিক সওয়াব মনে করতেন। অথচ আজ আমরা বলতে শুরু করেছি যে, ঘরে খুশুখুযু অর্জিত হয় না, এটি নিছক শয়তানের ধোঁকা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় নিজের কামরায় নফল নামায আদায় করতেন। আর হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর সামনে পা সম্প্রসারিত করে শুয়ে থাকতেন। সিজদার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পা স্পর্শ করলে তিনি পা গুটিয়ে নিতেন। এভাবে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর পরও হযরত আয়েশা রাযি.-এর পা পুনরায় প্রসারিত হয়ে যেত। কারণ অন্ধকার রাতে ঘরে সে রকম কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না; আবার ঘরও ছিল অপ্রশস্ত, তাতে একজন ঘুমন্ত থাকাবস্থায় অনায়াসে অন্য ব্যক্তি সিজদা করতে পারত না। এদিকে মসজিদে নববী ঘরের এতই সন্নিকটে ছিল যে, ঘর থেকে পা বাড়ালেই মসজিদ। এত কাছে মসজিদে নববী যার ফযীলতও অন্যান্য মসজিদের তুলনায় অত্যধিক। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হুজরা মুবারকেই নফল আদায় করতেন। নফল পড়ার জন্য মসজিদে যেতেন না।

অনেকে বলে থাকেন যে, ঘরে একাকী নামায আদায় করতে গেলে দ্রুত ঘুম এসে যায়; পক্ষান্তরে সম্মিলিতভাবে মসজিদে ইবাদত করলে, কিছু ওয়ায নসীহত হলে, কিছু নফল নামায জামাতে আদায় করা হলে ঘুম দূর হয়ে যায়। এভাবে অনেক বেশি ইবাদতের সুযোগ হয়। কিন্তু ঘরে নফল পড়তে গেলে এর অর্ধেক করাও সম্ভব নয়।

খুব ভালোভাবে বুঝে নেয়া চাই! ইবাদতে আধিক্যতা কিংবা তার পরিমাণ উদ্দেশ্য নয়; বরং ইবাদতের গুণাগুন ও অবস্থার ওপরই সওয়াব নির্ভরশীল। সুন্নত পদ্ধতিতে সামান্য ইবাদত করা সুন্নত বিরোধী পদ্ধতিতে

ব্যাপক ইবাদত করা থেকে লক্ষগুণ বেশি সওয়াবের। আর নফলের ক্ষেত্রে সুন্নত হচ্ছে অন্তরের স্বাচ্ছন্দতা ও উৎফুলতা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ নফলে লিপ্ত থাকা, উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে গেলে এবং বিরক্তি এসে গেলে বিশ্রাম করা। এটাই হাদীসের শিক্ষা। —আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৭৩

ফাতাওয়া শামী : ১/৬৪২, আগলাতুল আওয়াম : ১১৭

মাসআলা : শবে বরাত এবং শবে কদরের তালাশ ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে একত্রিত হওয়াকে জরুরি মনে করা মাকরূহ ও বিদআত। যে ব্যক্তি সারারাত ইবাদতে লিপ্ত থাকে অথচ তার সাওয়াবের নিয়ত না থাকে, কিংবা গুনাহ সমূহ থেকে মুক্ত না থাকে তবে উক্ত ব্যক্তির নির্ঘুম থাকার কষ্ট ব্যতীত অন্য কোন সওয়াব অর্জন হয় না। সকল ইবাদতের একই বিধান। অর্থাৎ লৌকিকতার জন্য যা করা হয় সবগুলোই সওয়াব বঞ্চিত থাকে। —ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/১৭

মাসআলা : শবে বরাতে মিষ্টান্ন, হালুয়া ইত্যাদি পাকানো, ঘর দরজা পরিস্কার করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা, রাতের বেলায় ঘর এবং কবরস্থানে আলোকসজ্জা করা, চন্দন, আগরবাতি ইত্যাদি দ্বারা সুগন্ধি দেয়া এবং এসব বিষয়কে সুন্নত বলা ভিত্তিহীন কথা। আর এসব রাতে বুযুর্গগণের রুহ ঘরে আসার ব্যাপারে কোন গ্রহণযোগ্য দলীল নেই। এর পক্ষে যেসব বর্ণনা পেশ করা হয়, মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট সে গুলো শুদ্ধ নয়।

—ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/১৮৩

মাসআলা : শবেবরাতে রাতের বেলায় নফল ইবাদত করে দিনে রোযা রাখা এবং সুযোগ হলে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা উত্তম। এছাড়া আতশবাজি করা, নফল নামায জামাতে আদায় করা, কবরস্থানে জড়ো হয়ে উৎসব করা, গুরুত্বের সাথে হালুয়া-রুটি বানানো ইত্যাদি কুসংস্কার, অবশ্যই বর্জনীয়।

মাসআলা : শবে বরাতে হালুয়া পাকিয়ে হযরত ওয়ায়েস করনী রহ. এর নামে ঈসালে সওয়াবকে জরুরী মনে করার কোন প্রমাণ নেই। এসব বিষয় যদি প্রমাণিতই হত তাহলে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এবং মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত থাকত। যখন এগুলো প্রমাণিতই নেই তাহলে এগুলোকে দ্বীনের কাজ মনে করা বিদআত এবং বর্জনীয়। —ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৫/৪০৫

মাসআলা : বে-নামাযীদেরকে নামাযে শরীক করার জন্য শবে বরাতে তাহাজ্জুদের জামাতের ঘোষণা করা মাকরূহ এবং নিষিদ্ধ। বরং বে-নামাযীদেরকে নামাযের বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন করতে হবে যাতে তারা নামাযের প্রতি গুরুত্ব দিতে শিখে। ফরয তরক করা মেনে নিয়ে মাকরূহ কাজের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো না বুদ্ধিমানের কাজ না আছে শরীয়তে এর কোন অনুমতি। অতএব এ রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ। —ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৫/৪৩১

মাসআলা : উক্ত রাত সমূহে আলোকসজ্জা করা এবং মাসজিদের তাকে মোমবাতি ইত্যাদি রাখার যে প্রচলন রয়েছে তা সম্পূর্ণ বিদআত। এটা হিন্দুদের দেওয়ালী উৎসবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নামাযীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত রসম ও রেওয়াজ হিসেবে মসজিদে আলোকসজ্জা করা অপচয় এটি হারাম। মুতাওয়াল্লী যদি মসজিদের মাল দ্বারা এগুলো করে থাকে তাকে অবশ্যই এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

—ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ২/২৮৮

১২ই রবিউল আউয়াল রাতে আলোকসজ্জা করা

মাসআলা : খাতামুল আম্বিয়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রদ্ধা ও ভক্তি, মুহাব্বত ও ভালোবাসা এবং তাঁর ব্যাপারে সু ধারণা ঈমানের মূল ভিত্তি। যে হতভাগার হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত ও ভালোবাসা নেই প্রকৃত পক্ষে সে ঈমান শূন্য। কুরআন হাদীসের শিক্ষা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত ও আকিদত ঈমানের মূল ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত ও আকিদতের পদ্ধতি কুরআন হাদীসই আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সর্বাধিক মুহাব্বত ও ভালোবাসা পোষণকারী সাহাবায়ে কেরামগণ রাযি. বাস্তবে আমাদেরকে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

১২ ই রবিউল আউয়ালে আলোকসজ্জা করা যদি বরকতের কাজই হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন। আর সাহাবায়ে কেরামগণও প্রাণ খুলে আলোকসজ্জা করতেন।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না এমনটি করেছেন, না কাউকে আদেশ করেছেন, না কোন সাহাবী, তাবেঈ, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং বুযুর্গানেদ্বীন যেমন-খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী, গাউসুল আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. প্রমুখ কেউ এমনটি করেছেন, না এগুলো করার জন্য তাঁরা কাউকে অনুমতি দিয়েছেন।

এ তারিখে আলোকসজ্জা করা যদি সওয়াবের কাজই হতো তবে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানপ্রাণ দিয়ে মুহাব্বতকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং উপরে বর্ণিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই আলোকসজ্জা করতেন। খাইরুলকুরূন বা ইসলামের সোনালী যুগে এভাবে আলোকসজ্জার অস্তিত্ব না থাকা এ বিষয়টি সাওয়াবের কাজ না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং এ কাজকে নেক কাজ মনে করে এর মাধ্যমে সাওয়াবের আশা করা বিদআত ও গুনাহ। এজন্যই বরকতপূর্ণ রাতসমূহে আলোকসজ্জা করাকে অগ্নি পূজারীদের সাদৃশ্যতার কারণে ফুকাহায়ে কেরাম বিদআত সাব্যস্ত করেছেন।

–ফাতাওয়া মহমূদিয়া : ১/২২৪, আপকে মাসায়েল : ৮/১৪৩

রবিউল আউয়াল মাসের প্রথা সমূহ

এটাই কি নবী প্রেমের দাবী?

রবিউল আউয়ালে বিভিন্ন এলাকায় মীলাদুন্নবী উপলক্ষে আনন্দ উৎসব, আলোচনা সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়, চাঁদা উত্তোলন করে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এবং মসজিদগুলো বিশেষভাবে সাজানো হয়। হিন্দুদের বিয়ের অনুষ্ঠানের ন্যায় বিশেষ ধরনের ঝুল ও পাড় দিয়ে মসজিদে ছাউনী দেয়া হয়। এখন তো রাস্তাঘাটও বিশেষভাবে সাজিয়ে আলোর ব্যাপক অপচয় করা হয় এসব উৎসবে। এটাকেই কি মুহাব্বত বলা হয়? হ্যাঁ মুহাব্বত ঠিক আছে তবে তা তাদের কুপ্রবৃত্তির মুহাব্বত।

তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমরাতো নিজেদের কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করেছো আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের অফুরন্ত ক্ষতি করেছ। ইসলাম বিরোধী যে ডামাডোল বাজছে,

তা প্রতিহত করার জন্য ইসলামের পক্ষের শক্তিকে তুমি কতটুকু সাহায্য করতে পেরেছ? ইসলামের পক্ষে কী কাজ করেছ? একদিকে ইসলামের জন্য কিছু নির্যাতিত বীরপুরুষ নিজেদের জীবনবাজি রেখে লড়ছেন, অন্যদিকে এসব বিদআতী মিষ্টি খাওয়ার পেছনে বিভোর হয়ে আছে। এদেরকে যদি কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তোমাদের এ অবস্থায় তাশরীফ আনেন আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মিষ্টি ক্রয় এবং মসজিদে আলোকসজ্জা করার জন্য যে চাঁদা আমরা উত্তোলন করেছি তা কি মিষ্টি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করব? নাকি আপনার জানবাজ মুজাহিদ এবং মজলুম মুসলমানদের জন্য ব্যয় করব? তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এ জবাব দিবেন যে তোমরা মিষ্টি ক্রয়ের জন্য তা ব্যয় কর?

বন্ধুরা! কোন ব্যথিত ব্যক্তির জন্য এ অবস্থায় মিষ্টি খাওয়া শোভা পাবে-কি? হায়! কোন মুখে এ অবস্থায় মিষ্টি খাওয়া আসে? কত মারাত্মক অনুভূতিহীনতা? কত বড় অন্যায়? আরো ক্রোধের কথা হচ্ছে এরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতের দাবী করে। ভাইয়েরা! তোমরা তো মীলাদুন্নবী উৎসব উদযাপন করেছ আর মুজাহিদগণ তাদের জীবনবাজি রেখে লড়াই করছেন, তাহলে কারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমিক? চিন্তা করো।

ঈদে মীলাদুন্নবীর আধুনিকায়ন এবং রাজনৈতিক রূপদান

পূর্বেকার লোকদের মাঝে ঈদে মীলদুন্নবী উদযাপনের পদ্ধতি ছিল এ উপলক্ষে পোষাক পরিবর্তন করা, বাড়ি ঘর সাজানো, বন্ধু বান্ধবকে একত্রিত করা, প্রথা হিসেবে যিকির আযকারের প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং মিষ্টান্ন বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা। কিন্তু বর্তমানে লোকজন এটাকে রাজনৈতিক রূপদান করে এ উপলক্ষে সকলে সমবেত হয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতপূর্বক দু'আ করাকে আবশ্যক মনে করে। উল্লে-খ্য, মুসলমানদের কল্যাণ ও সফলতার জন্য দু'আ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম ইবাদত। কিন্তু দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটানো কত মারাত্মক, তা তো আমাদের বুঝে আসে না। তদ্রূপ একই তারিখে দুআর জন্য এভাবে সমবেত হওয়া জায়েয হয় কি ভাবে?

অনেকে বলে থাকে এর মাঝে দ্বীনের মর্যাদা ও বীরত্ব নিহিত রয়েছে। একজন মৌলভী একবার আমাকে বললেন যে, তা'যিয়া থেকে বারণ করা উচিত নয়, কারণ এর মাধ্যমে বীরত্বের অনুশীলন ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে আরেক লোক বলে, শবে বরাতে আতশবাজি থেকে নিষেধ করা ঠিক নয়, কেননা এর মাধ্যমে বীরত্বের স্পিরিট সুসংহত হয়।

আল্লাহু আকবার! অনুভূতিহীনতা কত প্রকট আকার ধারণ করেছে। আর লোকদের বিবেক লোপ পেয়ে গেছে কিভাবে। এদের হাতেই যদি দ্বীনের সংযোজন বিয়োজন ক্ষমতা থাকত তবে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন এরা দ্বীনকে কাটছাট করে কোথায় নিয়ে পৌছাত।

বন্ধুরা! তোমাদের উপর ফয়সালাকারী এবং পথ-প্রদর্শনকারী একটা শরীয়ত রয়েছে। অতএব এসব কুসংস্কার তোমরা অবশ্যই বর্জন করবে। তোমাদের খুশিমত কোন নিয়মনীতি বানিয়ে নেয়ার অধিকার তোমাদের কাউকে দেয়া হয় নি। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য যে সকল বিধি-বিধান ও নিয়মনীতি দেয়া হয়েছে সে গুলোর ওপর আমল করার ব্যাপারে তোমরা আদিষ্ট। (তোমাদের অবশ্যই সেগুলো মেনে চলতে হবে।)

যদি কোন বিদআতকে মুসলমানদের জন্য উপকারী জ্ঞান করেই আবিস্কার করে, তবে তা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয়ের সংযোজন হওয়ার কারণে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। যারা বিদআতের মধ্যে উপকারিতা থাকার দাবি করে তাদের ব্যাপারে উক্ত জওয়াব প্রযোজ্য। বন্ধুরা! বিদআতের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর কঠিন আপত্তি উত্থাপিত হয়। এভাবে যে, অমুক কাজটি উপকারী হওয়া স্বত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের মধ্যে তা যুক্ত করেন নি। নাউযুবিল্লাহ।

ঈদে মীলাদুন্নবীর ব্যাপারে বর্তমানে এ জাতীয় কথার ফুলঝুরি ছাড়া হয়, যা একেবারেই অবাস্তব অসত্য ও অযৌক্তিক।

ঈদে মীলাদুন্নবীর আবিস্কার

ঈদে মীলাদুন্নবীর আবিস্কার এক মহাভুল। এটি আবিস্কার করেন একজন মুসলিম বাদশাহ।

—ইখতেলামে উম্মত আত্তর সিরাতে মুসতাকীম : ৭৮

খ্রিস্টানদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যেই নাকি এর আবিস্কার। খ্রিষ্টানরা যেভাবে বড়দিন উপলক্ষে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উৎসব উদযাপন করে মুসলানরাও যেন ঈদে মীলাদুন্নবীতে উৎসব উৎযাপন করতে পারে সে জন্যই এ প্রথার আবিস্কার করা হয়। সতর্ক হওয়া উচিত! শুধু মিষ্টি বন্টন করলেই কিংবা কিছু লোকের সমাগম হলেই কেবল অমুসলিমদের বিরোধিতা হয় না।

সম্মানিত ভাইয়েরা! এসব ধার করা সৌন্দর্যের প্রয়োজন ইসলামের নেই। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য তো সেটাই যা হযরত ওমর রাযি. সিরিয়ায় যাওয়ার পর সিরিয়াবাসী তাঁকে নতুন পোশাক পরার জন্য অনুরোধ করলে তিনি জবাবে বলেন نحن قوم اعزنا الله بالاسلام আমরা ঐজাতি যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।

বন্ধুগণ! আমরা যদি বাস্তবেই প্রকৃত মুসলমান হতে পারি তবে সকলের নিকটই আমাদের সম্মান থাকবে। সম্মান তো উপায় উপকরণ দিয়ে অর্জন করা যায় না, বরং উপকরণহীনভাবেই ইজ্জত চলে আসে।

✪ বিদআত এর পরিচয় হচ্ছে যে বিষয়টি কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস তথা শরীয়তের এ চারটি মূল উৎসের কোনটি দ্বারা প্রমাণিত না থাকে, তা যদি দ্বীন হিসেবে করা হয় তাই বিদআত। এই মূলনীতি বুঝার পর এবার দেখুন! আমাদের যে সব ভাই ঈদে মীলাদুন্নবী নামে ১২ ই রবীউল আউয়াল উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে এবং ওরস ইত্যাদিতে লিপ্ত হয় এগুলোর কোনটিই শরীয়তের মূল উৎস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এগুলোকে দ্বীন মনে করে উদযাপন করা একেবারেই নিকৃষ্ট বিদআত এবং নিষিদ্ধ।

নব আবিস্কৃত বিষয়াবলী দু'প্রকার

সুতরাং জেনে নেয়া চাই যে, ইসলামের সোনালী যুগ তথা খাইরুল কুরূন এর পরবর্তী যুগে যে সব বিষয়/বস্তু আবিস্কার করা হয় তা দুই প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার হচ্ছে- যার আবিস্কারের কারণ নুতন। অর্থাৎ খাইরুল কুরূনে এর প্রয়োজন অনুভূত হয়নি; আর তার উপর কোন শরঈ বিধান সংশ্লিষ্ট থাকে অর্থাৎ এই বিষয়টি ছাড়া উক্ত শরঈ বিধানের ওপর আমল

করা যায় না। যেমন ঃ দ্বীনী কিতাবপত্র সংকলন, মাদরাসা এবং খানকাহ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এগুলোর প্রয়োজন ছিল না, তাই এগুলোর আবিস্কারের কারণও নতুন। আর এগুলো এমন প্রয়োজনীয় বিষয় যে, শরীয়তের বিধান এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে একথা সর্বজন বিদিত যে, দ্বীনের হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব সকলের।

আর খায়রুল কুরূনে ইসলামের হেফাযতের জন্য বর্তমানের ন্যায় এসব নতুন উপকরণ ও বিষয়ের প্রয়োজন ছিল না। তখনকার মানুষের স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, কোন কথা শুনা মাত্রই তা পাথরে খোদাই করার ন্যায় জমে বসে যেত, তাঁদের বুঝ শক্তি ছিল এত তীক্ষ্ম যে, পাঠদান পদ্ধতিতে তাদেরকে বুঝানোর প্রয়োজন পড়ত না। দ্বীনদারী ও খোদাভীতি ছিল তাদের মাঝে অতুলনীয়।

যুগের আবর্তনে পরবর্তীতে মানুষের মাঝে উদাসীনতা বেড়ে স্মৃতি শক্তি লোপ পেতে থাকে, অন্যদিকে প্রবৃত্তিবাদী এবং যুক্তির পূজারীদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বাড়তে থাকে। মানুষের মাঝে দ্বীনদারীর মাত্রা অনাকাঙ্খিত হারে হ্রাস পেতে থাকে। ফলে উম্মতের ওলামায়ে কেরাম দ্বীনের অবলুপ্তি ও বিলীন হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েন।

এ অবস্থা দৃষ্টে তাঁরা দ্বীনের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও বিষয়ের প্রয়োজনীয় কিতাবাদি সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করেন। তাই দ্বীনী কিতাবগুলোর মধ্যে হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ এবং আকাঈদের কিতাব সমূহ সংকলিত হয় এবং এগুলো পাঠদানের জন্য মাদরাসা সমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কারণ এগুলো ব্যতীত দ্বীনের সংরক্ষণের অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতি বাকি রয়নি।

এগুলোই হচ্ছে ঐ সব নব আবিস্কৃত বিষয় যেগুলোর আবিস্কারের কারণও নতুন যা খায়রুল কুরূন তথা সাহাবী এবং তাবেঈগণের যুগে ছিলনা, আর দ্বীনের হেফাযতও এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এসব বিষয় বাহ্যত বিদআত মনে হলেও বাস্তবে এগুলো বিদআত নয়। বরং مقدمة الواجب واجب ওয়াজিব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উকরণও ওয়াজিব, এই মূলনীতি হিসেবে এটাও ওয়াজিব।

নব আবিস্কৃত বিষয়াবলীর দ্বিতীয় প্রকার

দ্বিতীয় প্রকারের বস্তু সমূহ হচ্ছে যে গুলোর আবিস্কারের কারণ প্রাচীন। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এবং তাবেঈনদের যুগে যা বিদ্যমান ছিল। যেমন প্রচলিত মিলাদের অনুষ্ঠানাবলী, মৃত্যু পরবর্তী তৃতীয়, দশম এবং চল্লিশতম দিবসে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে সংঘটিত অনুষ্ঠান উদযাপনের বিদআতসমূহ। এগুলোর কারণ এবং উপলক্ষ অনেক প্রাচীন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান উদযাপনের কারণ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জন্ম উপলক্ষে আনন্দিত হওয়া। আর এ কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও ছিল। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এ উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠান উদযাপন করেন নি। এখন প্রশ্ন উঠে যে, সাহাবায়ে কেরামগণ রাযি. কি এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেন নি? নাউযুবিলাহ!

যদি এর কারণ বা উপলক্ষ তখন না থাকত তাহলে হয়ত এটা বলা যেত যে, এর উপলক্ষ ও কারণ তখন ছিল না। কিন্তু তখনও তো তা ছিল। তারপরও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ রাযি. মীলাদুন্নবী উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেননি কেন? অতএব এ জাতীয় নব আবিস্কৃত বিষয়াবলীর বিধান হচ্ছে এগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় দৃষ্টি কোণ থেকেই বিদআত।

সুন্নত এবং বিদআত চেনার এটিই মানদন্ড ও মূলনীতি। এ থেকে শাখাগত বিরোধপূর্ণ সকল মাসআলার সমাধান বেরিয়ে আসে। উভয় প্রকারের বিদআতের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথম প্রকারের অবিস্কারক ও প্রতিষ্ঠাকারী হন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম। সাধারণ লোক তাতে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের আবিস্কারক হয় সাধারণ লোকজন, তারাই এতে সব ধরনের হস্তক্ষেপ করে থাকে। আর মীলাদ এর আস্কিারক হচ্ছে আবু সাঈদ মুযাফফর নামক একজন বাদশাহ। –ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুসতাকীম : ৭৮

সে ছিল সাধারণ একজন মানুষ, আলেম নয়। বর্তমানেও সাধারণ লোকজনই এর প্রতি আগ্রহী এবং এ বিষয়ে সার্বিক হস্তক্ষেপ তাদের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

ঈদ উৎসব উদযাপন একটি শরঈবিধান

ঈদ এমন উপলক্ষ ও সময়কে বলা হয়, যখন আমরা খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করার ব্যাপারে আদিষ্ট। যেহেতু এটা দ্বীনী আনন্দ উৎসব তাই এর উদযাপনের দ্বীনি পদ্ধতিও জেনে নেয়া আবশ্যক। আনন্দ দু'ধরনের হয়ে থাকে। ১. দুনিয়াবী আনন্দ ২. দ্বীনী আনন্দ। সুতরাং দ্বীনী উৎসব উদযাপনের জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য ওহীর নির্দেশনা আবশ্যক অর্থাৎ আমরা যদি দ্বীনি কোন উৎসব উদযাপন করতে চাই তবে আমাদেরকে দেখতে হবে এক্ষেত্রে উৎসব উদযাপনের ব্যাপারে শরীয়ত আমাদেরকে অনুমোদন দেয় কিনা? কেননা শরীয়ত বিরোধী কোনো পদ্ধতির আবিস্কার বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনবে। কারণ এটাতো হচ্ছে দ্বীনী বিষয়। আর দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিস্কারকে মূর্খ লোকজন দ্বীন হিসেবেই গহণ করবে, যা দ্বীনের মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াবী খুশীর মধ্যে যেহেতু সে ধরনের কোন ঝুঁকি নেই, তাই নিজের সুবিধা ও সুযোগ মত উৎসব পালন করার অবকাশ আছে। যদিও উৎসব পালনের ক্ষেত্রেও শরঈ নীতিমালা মেনে চলা আবশ্যক।

বর্তমানে হিন্দুস্থানে ১২ই রবিউল আউয়াল তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিন 'ঈদ'- হিসেবে উদযাপনের প্রবণতা আমার ভাইদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে।

(শুধু হিন্দুস্তানেই না আমাদের বাংলাদেশেও এ নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায় অনেক দল ও সংগঠন এ দিবস উপলক্ষে র‍্যালী বের করে, নানা প্রকার ফেষ্টুন ও ব্যানার নিয়ে ঈদ হিসেবে এ দিবসকে উদযাপন করে। এটি একেবারেই প্রকাশ্য গোমরাহী। আল্লাহ পাক আমদেরকে হেফাযত করুন। আমীন! -অনুবাদক)

আর এ প্রবণতা অমুসলিমদের দেখানো পদ্ধতি যা ধর্মীয় গুরুদের সাথে তারা করে থাকে, তাদের থেকে মুসলমানগণ এসব কুপ্রথা ধার করে নিয়েছে।

এ বিষয়ের বিধানও পূর্বোক্ত মূলনীতি থেকে জেনে নেয়া চাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম উপলক্ষে উৎসব করা

একটি নিছক দুনিয়াবী উৎসব উদযাপন নয়; বরং এটি দ্বীনি উৎসব। অতএব এর পদ্ধতি নির্ধারনের জন্য অহীর নির্দেশনা আবশ্যক।

শরীয়তে ঈদ দু'টি, তৃতীয় কোন ঈদ নেই

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দু'টি ঈদ দান করেছেন। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা" অথচ অজ্ঞ লোকেরা আরেকটি ঈদ বাড়িয়ে নিয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ তথা জন্ম উপলক্ষে ১২ ই রবিউল আউয়ালকে ঈদ হিসেবে নির্ধারণ করে, যা স্পষ্ট ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য ও আমলের সাথে সাংঘর্ষিক।

এর একটি উদাহরণ এ রকম যে ইংরেজদের আইন অনুযায়ী সরকারী ছুটির তালিকা নির্ধাতি হওয়ার পর তা কম্পোজ এবং প্রেসে পাঠানো হয়। কম্পোজকারী কিংবা প্রেস ওয়ালা যদি এর সাথে ছুটির দিন হিসেবে আরো একটা দিন বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ কালেক্টার সাহেবের নিয়োগের দিন অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ও উপলক্ষ হওয়ায় সেদিনের ছুটিও ছুটির ঘোষণা পত্রে সংযোজন করে দেয়। (কেননা কালেক্টর সাহেব বড় মাপের বিচারক।)

উক্ত ব্যক্তির এ অন্যায় হস্তক্ষেপের বিষয়ে আইনজীবিদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা কী বলবে? তারা অবশ্যই বলবে যে, এ লোকটি বড় অপরাধী। তাই এর বিরুদ্ধে কঠিন মামলা দায়ের হয়ে যাবে, আর যে কালেক্টর সাহেবের নিয়োগ উপলক্ষে ছুটির ঘোষণা দিয়েছে সেই কালেক্টর সাহেবই মামলা করে বসবে। কারণ খুশী ও উৎসব উদযাপন করা খারাপ বিষয় নয়। কিন্তু এর মাধ্যমে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনসাধারনের বে-আইনী ও অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়ে গেছে।

তদ্রূপ ১২ ই রবিউল আউয়ালে ভালো খাবার পাকানো, কাপড় পরিবর্তন করা, উৎসব উদযাপন করা এই বিষয়গুলো যদিও মৌলিকভাবে ঘৃণিত নয়; কিন্তু এ উপলক্ষ্যে এসব কাজ করার দ্বারা দ্বীনের বিধানকে বিগড়িয়ে দেয়া হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

কেবল দু'টি ঈদ উৎসব উদযাপনের অনুমোদন দিয়েছেন- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। সুতরাং এর বাইরে তৃতীয় কোন উপলক্ষকে ঈদ হিসেবে নির্ধারণ করা শরীয়তের বিধান বিকৃতির নামান্তর।

–হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর
ইফাদাত-নেদায়ে শাহী পত্রিকা, মে : ২০০৩

মিলাদ শরীফ পড়ার শরঈ বিধান

প্রশ্ন : মিলাদ শরীফ পড়ার শরঈ বিধান কি?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় জন্মের আলোচনা করা, তাঁর গড়ন-গঠন, পোষাক-পরিচ্ছদ, জুতা মুবারক, তাঁর উঠাবসা, খাওয়া ও পান করা, ঘুমানো এবং জাগ্রত হওয়া সর্বোপরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের যে কোন অধ্যায়ের আলোচনাই উত্তম এবং রহমত ও বরকত লাভের কারণ। এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তা এবং গুণাবলীর সাথে দূর সম্পর্কের সম্পর্কিত কোন বিষয়ের আলোচনা করাও সওয়াব থেকে খালি নয়, তবে ঐ আলোচনা যখন হবে হাদীসে বর্ণিত সহিহ ও বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে, তখনই তা হবে বরকতময়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের ইতিহাস আলোচনা করাও একটা পূণ্যের কাজ। এর সহীহ পদ্ধতি হচ্ছে দিনক্ষণ ও তারিখের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই কোন ওয়াযের মসলিসে কিংবা ক্লাসরুমে ছাত্রদের সাথে বা একাকী কুরআন হাদীসের আলোকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের আলোচনা, তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পূর্ণতা ও দক্ষতা, তাঁর মু'জিযা ইত্যাদি বর্ণনা করা বরকতপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী এবং নসীহত কারীকেও সুন্নতের প্রকৃত অনুসারী হতে হবে। কিন্তু আজকাল গতানুগতিক নিয়মে প্রথাগতভাবে মিলাদ মাহফিলে লোকজন সমবেত হয়ে জাহেলী কবিতা আবৃত্তি করে এবং এসব কবিতা পাঠের সময় বিভিন্ন ধরনের ছন্দ ও সুর তুলে থাকে। আর এ পদ্ধতিতে পড়াকে জরুরী মনে করে। এটা সুন্নত বিরোধী এবং বিদআত। সাহবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবয়ে তাবেঈন রহ. কারো থেকেই এমনটি প্রমাণিত নয়।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/২৮২,
আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৭০

মাসআলা : মিলাদ অনুষ্ঠানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের আলোচনার সময় কিয়াম করা ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত আকীদা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন বাণী, সাহাবী, তাবেঈন ও তাবয়ে তাবেয়ীন কারো কোন কথা বা কাজ দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত নয়। এটি বিদআত; যার কোন ভিত্তি নেই। এটা বর্জন করা জরুরী।

মাসাআলা : কুরআনে কারীম, হাদীস শরীফ, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম কারো থেকে প্রচলিত মিলাদ প্রমাণিত নয়। বরং ৬ শতাব্দী পর্যন্ত উম্মতের কারো থেকে এ উপলক্ষে মজলিস সংঘটিত করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৬০৪ হিজরীতে বাদশাহ আবু সাঈদ মুযাফফর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ পোষকতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এরপর থেকে তার আগ্রহ দেখে তার অনুসরণে মন্ত্রী এবং আমীরগণ এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মজলিসের আয়োজন শুরু করে।

সে সময় থেকেই হক্কানী ওলামায়ে কেরাম এ কাজের বিরোধিতা করে আসছেন এখনও এর খন্ডন চলছে।

মুহাররম, রবিউল আউয়াল উপলক্ষে ওয়ায করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে মসজিদ সমূহে মুহাররমের ১ম তারিখ থেকে দশম তারিখ পর্যন্ত, রবিউল আউয়ালের ১ম তারিখ থেকে ১১ তম তারিখ পর্যন্ত, ২৭ ই রজব, শাবান এর ১৪ তারিখ দিবাগত রাত, রমযানের ২৭ তারিখ সাতাইশা রাত, যিলহজ্জের নবম তারিখের রাতসহ এসব রাতে ইশার নামাযের পর ওয়ায নসীহত করা হয়। উক্ত রাতগুলো ব্যতীত অন্য সময়ে কারো ওয়ায করানোরও তাওফীক হয় না, আর ওয়াযকারীরাও স্বেচ্ছায় সুযোগ বের করেন না। এভাবে রাত নির্ধারণ করে ওয়ায নসীহতের শরঈ বিধান কী?

উত্তর : উপরোক্ত রাত সমূহে নির্দিষ্টভাবে ওয়ায করার শরঈ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর ইসলামের সোনালী যুগে এ প্রচলন ছিল না। অতএব এসব রাতে ওয়ায নসীহতকে আবশ্যক মনে করা এবং যারা করেনা বা শুনেনা তাদেরকে ঠাট্টা উপহাস করা, গালি দেয়া, এবং এ দিন ও রাতগুলোর সাথেই ওয়ায নসীহতের সওয়াবকে নির্ধারণ করা বিদআত।

বর্তমানে ব্যাপকভাবে উল্লেখিত রাতসমূহে ওয়ায নসীহত করাকে জরুরী এবং সওয়াবের কারণ ও উপলক্ষ মনে করা হয়; নিঃসন্দেহে তা বিদআত । নিজ উদ্যোগে কোনরূপ আবশ্যকতা ও চাপাপাচি ছাড়াই কিংবা কোন সাময়িক প্রয়োজনে ওয়ায করা জায়েয। কোনো মুসলমান এসব রাতে নির্দিষ্ট ভাবে ওয়ায করাকে জরুরী এবং আবশ্যক মনে করবে না; বরং আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দিবে এবং এসব দিবসকে নির্দিষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে আর স্বতন্ত্রভাবে তাবলীগ এবং তালিম এর ব্যবস্থা করবে।

মুহাররম মাসকে শোকের মাস বলা

মাসআলা : মুহাররম মাসকে শোকের মাস বলা এবং মাসে বিবাহ শাদী ইত্যাদিকে অশুভ ও বরকতহীন মনে করা জায়েয নেই। এটি মারাত্মক গুনাহ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বিরোধী। ইসলাম যে সব বিষয় হালাল করেছে বিশ্বাসগত হোক কিংবা কর্মগত, সেগুলোকে নাজায়েয এবং হারাম মনে করলে ঈমান ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে ঈমান চলে যায়। –বুখারী শরীফ : ২/৮০৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৩/১৯১, মুসলিম শরীফ : ১/৪৮৬

মাসআলা : মুহাররমের ১০ তারিখে হযরত হোসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করা (যদিও তা সহীহ বর্ণনার মধ্যমে হোক) সিরিয়াল দিয়ে শরবত পান করানো, শরবত পান করানোর জন্য চাঁদা দেয়া এবং দুধ পান করানো এসব কিছুই ভিত্তিহীন। এগুলো শিয়াদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে হারাম। –ফাতাওয়া রশীদিয়া : ১৩৯

মাসআলা : শীতের ঋতু হলেও উক্ত তারিখে শরবত পান করা জরুরী মনে করা আরেক ভ্রান্তি এবং ভিত্তিহীন কাজ। আরো একটি মারাত্মক ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তা হলো "হযরত হোসাইন রাযি. তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন, তাই লোকদেরকে পান করানো শরবত তাঁর পিপাসা নিবারণ করে", এই ভ্রান্ত আকীদাটিও সংশোধন করা আবশ্যক। মূলত: এসব শরবত তাঁর পর্যন্ত কখনোই পৌঁছেনা, আর এ শরবতের প্রয়োজনও নেই তাঁর। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর জন্য যত লোভনীয় ও আকর্ষণীয় নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, সে গুলোর মোকাবিলায় এ শরবত একেবারেই তুচ্ছ, যা তুলনারই অযোগ্য। –মাহমূদিয়া : ১৫/৪২৮

মাসআলা : ১০ই মুহাররম এবং ১২ ই রবিউল আউয়াল তারিখে কাজ কারবার বন্ধ রাখার নির্দেশ বা বৈধতা শরীয়তে নেই।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ৫/৩৯১

তা'যিয়া বানানো অবৈধ হওয়ার প্রমাণ

তা'যিয়া বা কৃত্রিম কবর বানিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করার বিষয়টি দ্বীন এবং ঈমান বিরোধী হওয়া দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ তোমরা কি তোমাদের বানানো বস্তু সমূহের উপাসনা করছ? একথা সুস্পষ্ট যে, মানুষ নিজ হাতে পছন্দমত আকৃতি দিয়ে তাযিয়া বানিয়ে থাকে এবং এর উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন মান্নত করে। আর বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন পুরনের জন্য এর কাছে প্রার্থনা করে সন্তানদের সুস্বাস্থ্যের জন্য দু'আ ও প্রার্থনা করাসহ এগুলোর সিজদাও করা হয়। তাজিয়ার যিয়ারতকে ইমাম হোসাইন রাযি.-এর যিয়ারতের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মনে করা হয়। এসব কাজ ঈমান এবং ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক নয় কি? এসব কাজ বিদআত এবং নাজায়েয।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/২৭৫, ফাতাওয়া রশীদিয়া : ৫৭৬

মাসআলা : মুহররমের তা'যিয়ার সামনে যেভাবে খেলাধুলা করা হয় শরঈ দৃষ্টিতে তা ভিত্তিহীন এবং নাজায়েয, এটা শিয়াদের আবিস্কার; হযরত আলী রাযি. থেকে এমন কিছু প্রমাণিত নয়।

–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ৬/১২৯

প্রাণহীন বস্তুর ছবি আঁকা

মাসআলা : প্রাণহীন বস্তুর ছবি অঙ্কন করার জন্য শর্ত হচ্ছে এগুলোর ইবাদত করা যাবে না এবং শরীয়ত বিরোধী পদ্ধতিতে সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। কিন্তু তা'যিয়া প্রথা বিশ্বাসগত এবং বুনিয়াদী খারাপি থেকে মুক্ত নয়; বরং তা'যিয়ার সিজদা করা, এর তাওয়াফ করা, এটাকে উদ্দেশ্য করে মান্নত করা এবং তা'যিয়া এর নিকট বিভিন্ন উদ্দেশ্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি কাজ শরীয়ত বিরোধী । অতএব, তা'যিয়া বানানো এবং ঘরে লটকানো কোনটিই জায়েয নেই। বায়তুল্লাহ শরীফের ছবির সাথেও যদি উপরোক্ত কাজগুলো করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও তা নাজায়েয হবে।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/২৭৭, ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ২/২৬

মাসআলা : তা'যিয়া ও শোকসভা ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রে ও সকল স্থানে নাজায়েয এবং কবীরাগুনাহ। বিশেষভাবে মসজিদে এসব করা মারাত্মক অন্যায়, যা আল্লাহ্ পাকের নিকট ভৎসনাযোগ্য অপরাধ। এ জাতীয় অন্যায় ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। এসব কাজ কবীরা গুনাহ; কুফর নয়। এগুলো বারবার করা পাপাচারিতা, যা তা'যির (শাস্তি) যোগ্য অপরাধ। —আযীযুল ফাতাওয়া : ৪/১৫

মাসআলা : আশুরা দিবসে বিশেষভাবে করণীয় কাজ হিসেবে শরীয়ত দু'টি জিনিস নির্ধারণ করেছে। ১। রোযা রাখা, ২। পরিবারের সদস্যদের জন্য যথাসম্ভব উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করা। হাদীস শরীফে এসেছে যে ব্যক্তি আশুরার দিবসে নিজের পরিবারের সদস্যদের উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করবে আল্লাহ তা'আলা পুরা বছর তার রিযিকে প্রশস্ততা ও বরকত দান করবেন। এদিনে নফল হিসেবে করণীয় আর কিছুর হুকুম নেই।

—মিশকাতুল মাসাবীহ : ১৯২৬,
ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৩৮০

মাসআলা : আশুরা তথা মুহাররমের দশ তারিখের রোযার সাথে ৯ বা ১১ তারিখে রোযা রাখবে। শুধু ১ টি রোযা রাখা মাকরূহ।

—ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৩৭৯, শামী : ২/১১৪
মারাকিল ফালাহ : ১২৪

মাসআলা : আশুরার তারিখে ঘোষণা দিয়ে জনসমাগমে মসজিদে গিয়ে নফল নামাযের গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নেই। অতএব নতুন আবিস্কৃত হওয়ায় তা বর্জনীয়। —ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৬/১৯১, কেফায়াতুল মুফতী : ১/২২৫

আশুরার রোযা হযরত হোসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের কারণে নয়

মাসআলা : মুহাররমের ১০ তারিখ ইসলামের পূর্ববর্তী সকল উম্মতের নিকট বড়ই সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ দিবস হিসেবে বিবেচিত হতো। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ. কে বনী ইসরাঈলসহ অত্যাচারী ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেছেন। আর অত্যাচারী ফিরআউনকে সদলবলে নীল নদে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন। তাই হযরত

মূসা আ. শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে রোযা রাখেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই তারিখে রোযা পালন করেন।

কারবালার ঘটনার পূর্ব থেকেই আশুরার ফযীলত ও গুরুত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত। হযরত হোসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের পর এ দিবসের ফযীলত আরো বেড়েছে। তবে এই শাহাদাতের জন্যই রোযা রাখতে হয় এ কথা একেবারেই ভুল। বিশুদ্ধ কথা হলো- আল্লাহ তা'আলা হযরত হোসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের জন্য আশুরার মত একটি বরকতময় দিবস নির্ধারণ করে। তাঁর শাহাদাতের মর্যাদা ও ফযীলত বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৩৮১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ৬/১৩২

১০ই মুহাররম শাহাদাত সভা করা

মাসআলা : আশুরা উপলক্ষে ১০ তারিখে শাহাদাত সভা করা শিয়াদের সাথে সামঞ্জস্যতার কারণে নিষিদ্ধ। মাতম করা, বিলাপ করা এবং শোক প্রকাশার্থে বুক চাপড়ানো হারাম। হাদীস শরীফে মুরসিয়া তথা শোকগাঁথা বিলাপ ইত্যাদি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। –সুনানে আবু দাউদ : ৩১২৭

বিশেষ কোন দিবসে অতিরিক্ত সওয়াবের আশায় সদকা, খানা বন্টন করা অহেতুক কাজ। ধনীর জন্য সদকা খাওয়া মাকরূহ। সাইয়েদ এর জন্য খাওয়া হারাম। –ফাতাওয়া রশীদিয়া : ১৩৯

মাসআলা : মুহাররমের ১০ তারিখে হযরত হোসাইন রাযি.-এর শাহাদাত সংক্রান্ত আলোচনা বিষয়ে হযরত গাঙ্গুহী রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হলে, এটা শিয়াদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে তিনি নাজায়েয লিখেছেন। হাদীস শরীফে এসেছ من تشبه بقوم فهو منهم যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্যতা স্থাপন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত। তাই শিয়াদের সাথে সামঞ্জস্যতা বর্জনের লক্ষ্যে বুযূর্গানে দ্বীন মুহাররমের ১০ তারিখে শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/২৯২

মাসআলা : ১০ই মুহাররম মসজিদে মিষ্টি বিতরণ করা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এটাকে শরঈ বিষয় মনে করা ভুল। তবে কিছু হাদীস দ্বারা ১০ তারিখে রোযা রাখার সওয়াব প্রমাণিত।

–তিরমীযি শরীফ : ৭৪৯, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৭৩৩

তদ্রূপ এ দিন খাবার দাবার একটু উন্নত করাও বরকতের কাজ।
—ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১৫/৪১৩

মুহাররম সংক্রান্ত কুপ্রথা সমূহের বিধান

প্রশ্ন : হযরত হোসাইন রাযি.-এর শাহাদাত উপলক্ষে শোক প্রকাশ করা, কালো কাপড় পরিধান করা, খালি মাথায় থাকা, মাথায় মাটি দেয়া, মাথা পিটানো, মুরসিয়া গাওয়া, বাচ্চাদেরকে বন্দী ফকীর বানানো, তা'যিয়ার স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা, মান্নত করা ইত্যাদি কাজ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : হযরত হোসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদায়ক এবং অন্তরে রক্তক্ষরণ সৃষ্টিকারী। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের প্রতি ভক্ত অনুরক্ত সকল মু'মিনকে ঘটনাটি বিশেষভাবে পীড়া দেয়। এই ঘটনা থেকে সকলকে সত্যের উপর অবিচল থাকার উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। কোন জালেম বাদশাহর সামনে মস্তক অবনত করার চাইতে শাহাদাতের অমীয় শরাব পান করার মর্যাদা অনেক বেশি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে সেই আদর্শ ও সত্যপথে চলার স্পৃহা গ্রহণের পরিবর্তে মূর্খতা ও বিভিন্ন কু-প্রথার পেছনে পড়ে সে গুলোকেই বাস্তব ও সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে। উল্লিখিত প্রশ্নে কিছু জিনিস আছে মাকরূহ, কিছু বিদআত, কিছু হারাম, আবার কিছু শিরক এর পর্যায়ের। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের তরীকা ও পদ্ধতির সাথে এগুলোর ন্যূনতম সম্পর্কও নেই; বরং এগুলো রাফেযী শিয়াদের ইউনিফর্ম। তাদের সংশ্রবে গিয়ে কিছু নির্বোধ ও বে-আমল লোকও এসব কুপ্রথায় ফেঁসে গিয়ে এগুলোকে জরুরী মনে করতে শুরু করেছে। —ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১২/২০১

প্রশ্ন : রবিউস সানী মাসে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর ওফাত উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম করে মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করা হয় এর শরঈ বিধান কী?

উত্তর : নিঃসন্দেহে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. অনেক বড় মাপের বুযূর্গ ছিলেন। তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ঈমানের লক্ষণ, আর তাঁর শানে বে-আদবী গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার প্রমাণ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদা হচ্ছে মাখলুকাতের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বড়। আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁদের পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা। তাঁদের পর আশারায়ে মুবাশ্বারাসহ সাহাবায়ে কেরামগণের মর্যাদা। এবার চিন্তা করুন! আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সাহাবা রাযি. গণের মত মহান মনীষীদের মৃত্যু দিবস পালন ও উদযাপনের ব্যাপারে শরীয়ত যেখানে অনুমতিই দেয় নি; সেখানে গাউসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর মৃত্যু দিবস পালন করার বৈধতা আসে কোত্থেকে? এর উদ্দেশ্যটা কী? সুতরাং বুঝা গেল প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা নিঃসন্দেহে বিদআত যা অবশ্য পরিহারযোগ্য।

—ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/২৮৬,
ফাতাওয়া রশীদিয়া : ১৩৯

প্রশ্ন : আত্মীয় স্বজনরা এ জাতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে খানা পাঠালে কিংবা মুহাররম মাসে আশুরার খিচুড়ী বা শবে বরাতে মিষ্টি ইত্যাদি ঘরে পাঠিয়ে দিলে খাওয়া জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : এ জাতীয় খাবার প্রস্তুতকারীরা যদি গায়রুল্লাহকে উপকার বা অপকার করার ক্ষমতাবান মনে করে, তাহলে তাদের এ কাজ শিরক বিধায় এ জাতীয় খাবার খাওয়া হারাম। তাই এরূপ খানা কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা জায়েয নেই। কিন্তু যদি উক্ত আকীদা না থাকে তাহলে খানা খাওয়া হারাম নয়। তবে এ কাজটি যেহেতু বিদআত, তাই বিদআতের সম্প্রচার এবং সহযোগিতার গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এসব খাবার যথাসম্ভব বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। —আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৮২

শবেবরাতে হালুয়া ইত্যাদি বানানো

মাসআলা : শবেবরাতের শরঈ ভিত্তি এতটুকু পাওয়া যায় যে, শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত এবং পনেরতম দিনটি এই মাসের মধ্যে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ এবং বরকতময়। আমাদের জনাব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রাতে মদিনার কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছেন। সুতরাং উক্ত রাতে কেউ যদি মৃতদের

ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কিছু করতে চায় তা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে হোক, খানা খাওয়ানোর মাধ্যমে কিংবা নগদ টাকা পয়সা ইত্যাদির মাধ্যমে হোক যেকোনভাবে ঈসালে সওয়াব করতে পারবে এবং সরাসরি গিয়ে কবর যিয়ারতও করতে পারে, এটাই সুন্নত পদ্ধতি। এর অতিরিক্ত যত কিছু মানুষ আবিস্কার করেছে। যেমন : হালুয়া রুটি বানিয়ে ফাতিহা পাঠের পর তা বিতরণকে জরুরী মনে করা- এগুলো একেবারেই গোমরাহী এবং কুসংস্কার। যে জিনিসকে শরীয়ত আবশ্যক করেনি তা আবশ্যক করে নেয়া কিংবা সীমাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া মন্দ এবং শরীয়ত গর্হিত কাজ।

–বেহেস্তী যিওয়ার : ৬/৬১,
নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১৭৪

মাসআলা : শবেবরাতে করণীয় আমল হিসেবে হাদীস শরীফে তিনটি কাজের কথা বলা হয়েছে।

১. উক্ত রাতে করব যিয়ারত করা। মৃতদের ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে সম্ভব হলে দানসদকা ও দুআ ইস্তেগফার করা। এগুলোই মৃতদের রূহে পৌঁছে। তবে এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

২. উক্ত রাতে জাগ্রত থেকে একাকী ইবাদত করা। তবে ডাকাডাকি ও ঘোষণা ছাড়াই কিছু লোক একত্রিত হয়েও ইবাদত করতে পারবে।

৩. ১৫ই শাবান নফল রোযা রাখা। এ আমল গুলো সুন্নাত পদ্ধতিতে আদায় করা অনেক উত্তম ও ফযীলতপূর্ণ।

মাসআলা : শবে বরাতের হালুয়া দ্বারা রমযানের প্রথম রোযার ইফতার করার মধ্যে অনেক সওয়াব পাওয়া যায় মর্মে যে কথা প্রচলিত রয়েছে তা একেবারেই ভুল। এর শরঈ কোন ভিত্তি নেই। আগলাতুল আওয়াম : ১২৩, বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাসায়েলে শবে বরাত ও শবে কদর।

প্রবল বৃষ্টিপাত বা মহামারিতে আযান দেয়া

মাসআলা : প্রবল বৃষ্টিপাত কিংবা মহামারির সময় ডাকাডাকি করে লোজনকে সমবেত না করে কুরআনে কারীম এর তিলাওয়াত করা যায় এতে কোনো অসুবিধা নেই, তা বৈধ। তবে খুব ডাকাডাকি করে এমনটি করার বৈধতা নেই। ফুকাহায়ে কেরাম নামায ব্যতীত যে সব ক্ষেত্রে

আযানের আলোচনা উল্লেখ করেছেন, উক্ত অবস্থা সে গুলোর আওতাভুক্ত হয় না। —কেফায়াতুল মুফতী:৯/৫৫, আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৭৬

মাসআলা : এ সকল ক্ষেত্রে আযান দেয়া শরঈভাবে প্রমাণিত নয়। তাই এমনটি করা বিদআত। এতে আরো দুটি গুনাহ হয়ে থাকে ঃ

১. নামাযের সময়ের মধ্যে খটকা সৃষ্টি হয়। তা এভাবে যে, রাতের বেলায় উপরোক্ত উদ্দেশ্যে আযান দিলে মানুষ ফজরের সুন্নত রাতের মধ্যেই পড়ে নিতে পারে অথবা সুবহে সাদিক হওয়ার ধারণায় ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই ফজরের ফরয রাতের বেলায় আদায় করে ফেলতে পারে।

২. রাতের বেলায় লোকজনের ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

বিদআত কাজ করার মাধ্যমে লোকজনের নামায নষ্ট করা, অসুস্থ ও দুর্বলদের অস্বস্থিতে ফেলা এবং সাধারণ মুসলমানদের কষ্টে নিপতিত করার মত শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে রহমতের আশা করা একেবারেই মুর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা। আল্লাহ তা'আলার আযাব-গজব থেকে বাঁচার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে গুনাহ বর্জন করা। সর্বশক্তিমান স্রষ্টার নাফরমানি থেকে তওবা ইস্তেগফার করে তাঁকে সন্তুষ্ট করাই মুমিনের মূল দায়িত্ব।

আজকাল যত মারাত্মক থেকে মারাত্মক গুনাহ এবং কঠিন শাস্তি যোগ্য অপরাধ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে করা হচ্ছে সেগুলোর পরিমাপ করা হলে দেখা যাবে বর্তমান সময়ের এক দিনের বদ আমল পূর্বের যুগের কয়েক বছরের গুনাহের চেয়েও অধিক। তারপরও এর সাথে সাথে আযানের ধারাবাহিকতা জারি রেখে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সবধরনের অপরাধ ও গুনাহ বর্জন করে বেশি বেশি ইস্তেগফার করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাসআলা : আযানের জওয়াবে اشهد ان لا اله الا الله এর জওয়াব হুবহু اشهد ان لا اله الا الله ই বলতে হবে। এর অতিরিক্ত محمد رسول الله বাড়িয়ে বলা দ্বীনের মধ্যে সংযোজন; যা বিদআত। মু'আযযিন যদি اشهد ان لا اله الا الله বলার পর উচ্চ আওয়াযে محمد رسول الله বলে তবে তার এ কাজকে

আযানের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে সকলেই নাজায়েয বলবে। একইভাবে জওয়াব দেয়ার সময় محمد رسول الله বাড়িয়ে বলা আযানের মধ্যে অতিরিক্ত অংশের সংযোজনের ন্যায় নাজায়েয।

–আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৭৮, নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১৯২, আগলাতুল আওয়াম : ৫২

মাসআলা : অনেকে আযান দাতা এবং দু'আয়রত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করাকে জায়েয মনে করে না, এর কোন ভিত্তি নেই।

–আগলাতুল আওয়াম : ৫২

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নাম শুনে আঙ্গুলে চুমু খাওয়া

মাসআলা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনে আঙ্গুলে চুমু খাওয়া না জায়েয। দরূদ শরীফ পাঠ করার গুরুত্ব ও ফযীলত বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোন সহীহ হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে লাগানোর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। –বুখারী শরীফ : ১/৩৭১, ফাতাওয়া রহীমিয়া : ২/৩০৪, ১/৫৮

মাসআলা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম শুনে হাতে চুমু খেয়ে চোখে হাত মোছা বিদআত। এ ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এ ব্যাপারে মাশায়েখদের এতটুকু আমল পাওয়া যায় যে, চোখের পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি আযানের সময় মুআযযিনের اشهد ان محمد رسول الله শুনার পর চোখ মুছে নিলে চোখের পীড়া ভাল হয়। তাই বলে এ কাজ সর্বদা করার জন্য তারাও বলেন নি। অতএব বিষয়টাকে হাদীস বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বলা নাজায়েয ও বিদআত। –নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১৯২, আইনুল হেদায়া : ১/৩৯১

সম্মিলিতভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করা

প্রশ্ন : জুমুআর নামাযের পর কিছু লোক জড়ো হয়ে ক্ষীণ আওয়াজে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে। এটা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : আবশ্যক এবং জরুরী না মনে করে কখনো কখনো এমনটি করা জায়েয হলেও ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যতে তা বিদআতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এর আবশ্যকতা ও গুরুত্ব বাড়তে থাকে, এবং ক্রমান্বয়ে এর সাথে বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক বিষয়াবলী যুক্ত হতে থাকে। শরীয়তে যেগুলোর কোন অস্তিত্ব প্রমাণিত নেই। এটা শরীয়তের মধ্যে নতুন সংযোজন ও বাড়াবাড়ি, যার অধিকার কাউকে দেয়া হয় নি। অতএব এ জাতীয় কাজ বর্জন করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী একাকী দরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। এটাই বরকতপূর্ণ ও সওয়াবের কাজ। —আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৮০

মাসআলা : খুতবার মধ্যে খতীব সাহেব يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا বলার পর শ্রোতাদের জন্য দরূদ শরীফ মৌখিকভাবে পড়া জায়েয নেই। যেহেতু খুতবা নামাযেরই ন্যায়; তাই খুতবার সময় মৌখিকভাবে দরূদ পড়া জায়েয নেই। মনে মনে পড়া যেতে পারে।

—আহসানুল ফাতাওয়া : ১/৩৮০

জুমআর নামাযের পর সম্মিলিতভাবে দরূদ পাঠ করা

প্রশ্ন : অনেক এলাকায় নামাযের পর বিশেষ করে জুমু'আর নামাযের পর মসজিদে সকলে সমবেত হয়ে সম্মিলিতভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে কিয়াম এবং বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে সালাত সালাম পাঠ করে। বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর এটাকে তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের নিদর্শণ মনে করে। তাদের সাথে যারা এ কাজে অংশ গ্রহণ না করে, তাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত বিরোধী এবং ভ্রান্ত আকীদা সম্পন্ন মনে করে।

প্রশ্ন : অনেকে সীমালঙ্ঘন করে তাদের বিরুদ্ধে কুফর এর ফাতওয়াও দিয়ে দেয়। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী?

উত্তর : নিঃসন্দেহে দরূদ শরীফ ও সালাত সালাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন ইবাদত। কুরআন মাজীদে বিশেষ গুরুত্বের সাথে এ ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। হাদীস শরীফেও এর বহু ফযীলত এবং উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় এর জন্যও বিশেষ

মূলনীতি, পদ্ধতি ও আদাব রয়েছে। যেগুলো মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এসব মূলনীতি ও আদাব বাদ দিয়ে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে মনগড়া কোন পদ্ধতিতে আমল করলে সওয়াব এর পরিবর্তে গুনাহ এবং নৈকট্য লাভের পরিবর্তে দূরে ছিটকে পড়তে হবে।

একটু চিন্তা করুন! কেউ যদি নামাযের তাকবীরে তাহরীমার পরিবর্তে দরূদ শরীফ পাঠ করে, সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা মিলানোর পরিবর্তে এবং এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার জন্য তাকবীর না বলে দরূদ শরীফ পড়ে, তদ্রূপ তাশাহহুদ এর পরিবর্তে দরূদ শরীফ পাঠকে জরুরী ও সওয়াবের কাজ মনে করে তবে আপনিই একটু বলুন, এসব ক্ষত্রে দরূদ শরীফ পাঠের অনুমতি আছে কি না? আর এ পদ্ধতিকে কি সঠিক বলা যাবে? নামায শুদ্ধ হবে?

বরং নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদশরীফ পাঠ করলে সাহুসিজদা ওয়াজিব হয়। তাই বুঝা গেল অননুমোদিত স্থানে এবং যত্রতত্র দরূদ শরীফ পাঠ করা সহীহ নয়।

দরূদ শরীফ একাকী পড়তে হবে। গুরুত্বের সাথে সম্মিলিতভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করা প্রমাণিত নেই। হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈন, মুহাদ্দিসীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আউলিয়ায়ে কেরাম, মাশায়েখে কেরাম, হযরত গাউসুল আযম খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী রহ, খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া প্রমুখ বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের কারো থেকেই নামাযের পর সম্মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে দরূদ পাঠ করা, সালাত ও সালাম বলার একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না। সুতরাং উক্ত পদ্ধতিতে সালাত ও সালাম পাঠ করা বিদআত। এ পদ্ধতির উদ্ভাবক, এর ওপর আমলকারী, এটা নিয়ে বাড়াবাড়িকারী এবং এটাকে দ্বীন বলে বিশ্বাসকারী আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের পাত্র। আর বিদআতের যেসব শাস্তি ও ধমকী এসেছে তা এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। —ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪৩০

সম্মিলিতভাবে প্রমাণিত নয় এমন কাজ সম্মিলিতভাবে পালন করা থেকে বাধা দিতে হবে

যে সব ইবাদত সম্মিলিতভাবে প্রমাণিত নয়, সে সব ইবাদত সম্মিলিতভাবে করাকে প্রয়োজনীয় মনে করা সঠিক পদ্ধতি নয়। তাই এ পদ্ধতিতে ইবাদত করা থেকে অন্যদেরকে বারণ করা জরুরী। আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরাম এ জাতীয় কার্যাবলী থেকে জোরালোভাবে বাধা প্রদান করেছেন। এর কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো।

১. চাশত এর নামায হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করা প্রমাণিত নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. কিছু লোককে মসজিদে গিয়ে সম্মিলিতভাবে চাশত নামায আদায় করতে দেখে তা অপছন্দ করেন এবং বিদআত বলে ঘোষণা করেন।

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, আমি এবং ওরওয়া ইবনে যুবাইর রহ. মসজিদে প্রবেশ করি, তখন হযরত ইবনে উমর হযরত আয়েশা রাযি.-এর হুজরায় উপবিষ্ট ছিলেন। আর কিছু লোক মসজিদে সম্মিলিতভাবে চাশতের নামায আদায় করতেছিল। (বর্ণনা কারী বলেন) আমরা হযরত ইবনে ওমর রাযি. কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, "এটি বিদআত"।

–বুখারী শরীফ : ১/২৩৮

২. ঈদগাহে যাওয়া আসার পথে الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد এই তাকবীর বলা মুস্তাহাব। কিন্তু সম্মিলিতভাবে উচ্চ আওয়াজে এবং ছন্দ মিলিয়ে পড়লে তা নিষিদ্ধ হবে। তাই প্রত্যেকে যার যার মত করে তাকবীর পড়বে। সম্মিলিতভাবে বলবে না।

–মাজালিসুল আবরার : ২৩১-২৩২

৩. ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শবে বরাত, রমযানুল মুবারকের শেষ দশ তারিখের রাতসমহ এবং যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন দশ রাতের ইবাদত অনেক ফযীলতপূর্ণ। কিন্তু এসব রাতে ইবাদত নফল নামায ইত্যাদির জন্য মসজিদে সমবেত হওয়াকে ফুকাহায়ে কেরাম মাকরূহ বলেছেন।

৪. জুমআর দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করার ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে মসজিদে সমবেত হওয়া এবং সম্মিলিতভাবে

তিলাওয়াত করা বিদআত। আল্লামা ইবনুল হাজ কিতাবুল মাদখালে উল্লেখ করেন وانما اجتماعهم لذلك فبدعة كما تقدم। সূরা কাহাফ তিলাওয়াতের জন্য জড়ো হওয়া বিদআত। -কিতাবুল মাদখাল : ২/৮২

৫. ইমাম নাফে রহ. বলেন, হযরত ইবনে ওমর রাযি.-এর সামনে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে الحمد لله والسلام على رسول الله বলে উঠলে তিনি বলেন- এ দু'আতো আমিও পাঠ করি; কিন্তু এ স্থানে তা পাঠ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দেন নি। বরং হাচির পর পাঠ করার জন্য আমাদেরকে এই দু'আটি শিক্ষা দিয়েছে- الحمد لله على كل حال -তিরমীযি : ২/৯৮, মিশকাত : ৪০৬

এ দু'আর মধ্যে والسلام على رسول الله এই বাড়তি অংশটি অর্থগতভাবে সম্পূর্ণ সহীহ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু এক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত অংশ পড়তে শিখাননি, তাই হযরত ইবনে ওমর রাযি. নিঃসংকোচে তৎক্ষণাত তার বিরোধিতা করেন।

ইমাম শাতেবী রহ. বলেন ইবাদতের মধ্যে এমন বিশেষ পদ্ধতি, অবস্থা ও সময় নির্ধারণ ও জরুরী করে নেয়া যা শরীয়তে প্রমাণিত নয় তা বিদআত এবং নাজায়েয। -আলই'তিসাম : ১/২৪

হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, যে কাজের ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে উৎসাহ দেয়া হয় নি, সে কাজের প্রতি উৎসাহ দেয়া, যে কাজের জন্য কোন সময় নির্ধারন করা হয় নি তার জন্য সময় নির্ধারণ করে নেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ল ামের সুন্নতের খেলাফ এবং হারাম। -মাজমুআয়ে ফাতাওয়া আযীযী-১/৯৯

আল বাহরুর রায়েক : ২/১৫৯ উদ্ধৃত হয়েছে-

ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت أو بشئ دون شيئ لم

يكن مشروعا حيث لم يرد به الشرع لانه خلاف المشروع.

আর আল্লাহ তা'আলার যিকির এর জন্য যদি বিশেষ সময় নির্ধারণ করাকে জরুরী করে নেয়া হয় তবে তা শরীয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে অবৈধ হবে।

একটি প্রশ্নের উত্তর

অনেকে বলে থাকে গুনাহের কী আছে? আমরা দরূদ শরীফই তো পড়ছি, গুনাহের কোন কারণ তো দেখছিনা।

এ আপত্তির জবাব আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, তা হচ্ছে অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং অননুমোদিত সময়ে কোন কাজ করা হলে তা তিরস্কারযোগ্য হয় এবং এর জন্য পাকড়াও হতে হয়।

দেখুন ভাই : একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাযি. ঈদগাহে গিয়ে এক ব্যক্তিকে ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামাযরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে নফল নামায থেকে বারণ করলেন। লোকটি আরয করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, নামায পড়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাস্তি দিবেন না। হযরত আলী রাযি. জবাবে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ করেননি আর করার প্রতি উদ্বুদ্ধও করেন নি উক্ত কাজ নিষ্ফল হওয়ার ব্যাপারে আমিও নিশ্চিত। সুতরাং এ জাতীয় অহেতুক ও নিষ্ফল কাজে কোন সওয়াব নেই, বরং এই ভয় আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি ও সুন্নত বিরোধী হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিতে পারেন। —মাজালিসুল আবরার : ১২৯ ও ১৮

✪ এক ব্যক্তি আসরের নামাযের পর দু'রাকাত নফল পড়তে আরম্ভ করলে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ. তাকে বারণ করেন। লোকটি বলে উঠলেন يا ابا محمد! ايعذبنى الله على الصلوة হে আবু মুহাম্মাদ! নামায পড়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাকে কি শাস্তি দিবেন? হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ. বললেন, لكن يعذبك الله بخلاف السنة (নামায তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়) কিন্তু সুন্নাত বিরোধী কাজ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে শাস্তি দিবেন। —মুসনাদে দারেমী

চিন্তা করুন! নামায অন্যতম একটি ইবাদত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখের শীতলতা, যা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। তথাপি ঈদের নামাযের পূর্বে এবং আসর

নামাযের পর নফল নামায পড়া সুন্নাত বিরোধী হওয়ায় তাঁরা এর থেকে কঠিন ভাবে বারণ করেছেন।

সুতরাং বোঝা গেল সম্মিলিতভাবে সালাম ও মীলাদ পড়ার প্রচলিত পদ্ধতি বিদআত।

✪ হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ রাযি. একবার কিছু লোককে মসজিদে উঁচু আওয়াযে দরূদ শরীফ পড়তে দেখে তাদেরকে বিদআতী সাব্যস্ত করে মসজিদ থেকে বের করে দেন।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪২৯, ৪৩৩

কিছু মসজিদে নিয়ম আছে ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত ভাবে اللهم انت السلام দু'আটি পড়ে মুনাজাত শেষ করে। প্রত্যেকে সুন্নাত নফল আদায়ের পর পুনরায় জড়ো হয়ে "আল ফাতেহা" শিরোনামে সম্মিলিত মুনাজাতে অংশগ্রহণ করে আর এটাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। ইমাম সাহেবের সাথে এ 'ফাতিহা' পাঠের শর্ত করা হয়, যারা দ্বিতীয় দু'আয় অংশ গ্রহণ না করে, তাদেরকে ফাতেহা বর্জনকারী, ওহাবী এবং ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী বলে গালি দেয়, এমনকি আহলে সুন্নত ওয়ালজামাআতের দলভুক্ত নয় বলেও তারা মনে করে। (نعوذ بالله)

দু'আর উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে ফরয নামায জামাতে আদায়ের পর সম্মিলিত ভাবে দু'আ করে সুন্নত ও নফল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আদায় করে প্রত্যেকে যার যার মত করে দু'আ করবে। সুন্নত ও নফলের পর প্রচলিত পদ্ধতিতে দ্বিতীয় দু'আ করা সুন্নত বিরোধী, ভিত্তিহীন এবং মনগড়া পদ্ধতি। সুন্নত ও নফল শেষে সকলে জড়ো হয়ে দু'আয় লিপ্ত হওয়া হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো কথা বা কাজ দ্বারা কিংবা সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কারো থেকেই প্রমাণিত নয়। বহু সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ও নিয়ম ছিল, তিনি সুন্নত ও নফল নামায ঘরে গিয়ে আদায় করতেন, আর সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-কেও এমনটিই নির্দেশনা দিতেন।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিব নামায আদায়ের পর তাদেরকে সুন্নত ও নফল মসজিদেই আদায় করতে দেখে ইরশাদ করলেন, এ নামাযগুলো তো ঘরে পড়ার যোগ্য। —আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত শরীফ : ১০৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম সুন্নত ও নফল ঘরে গিয়েই যেহেতু আদায় করতেন তাই সুন্নতের পর ইমাম মুক্তাদির সম্মিলিতভাবে দ্বিতীয় দু'আয় শরীক হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঘরে গিয়ে সুন্নত আদায়ের পর মসজিদে পুনরায় এসে দু'আ করা তো দূরের কথা কখনো সাহাবায়ে কেরামের সাথে বিশেষ কোন কারণে মসজিদে সুন্নত পড়ার সুযোগ হলে তখনও সম্মিলিতভাবে দু'আ করতেন না; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নত ও নফলে মশগুল থাকতেন আর সাহাবায়ে কেরামগণও যার যার নামাযে মগ্ন থাকতেন। মুক্তাদীগণ তাদের নামায থেকে ফারেগ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অপেক্ষা না করেই যার যার গন্তব্যে ফিরে যেতেন।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القرائة في الركعتين بعد المغرب حتى تفترق اهل المسجد.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিব নামাযের পর সুন্নত আদায়কালে এত দীর্ঘ কেরাত পড়তেন যে, মুসল্লিগণ মসজিদ হতে চলে যেতেন।

—আবু দাউদ : ১/১৯১

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে আরো বর্ণিত আছে তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামায আদায় করে নফল নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন, এক পর্যায়ে তিনি ব্যতীত মসজিদে আর কোস মুসল্লী অবশিষ্ট থাকেন নি।

—শরহু মা 'আনিল আছার : ১/২০১

এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, সুন্নতের পর দ্বিতীয় দু'আর প্রচলনের প্রশ্নই আসেনা। অতএব এটি সুন্নতবিরোধী মনগড়া পদ্ধতি, যা বর্জন করা আবশ্যক। —ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪৪৩, ১/২১৫, ২১৭

মাসআলা : হানাফী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়, যেসব নামাযের পর সুন্নতে মুআক্কাদাহ রয়েছে সে সব নামাযে নামাযের সালাম ফিরিয়ে সংক্ষেপে দু'আ করেই সুন্নতে লিপ্ত হওয়া চাই। সুন্নাত শেষে প্রত্যেকে যার যার কাজে মশগুল হবে।

আর যেসব নামাযের পর সুন্নত নেই ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসে মা'ছুর দু'আ গুলো পড়বেন এবং মুসল্লীদেরকে নিয়ে দু'আ করবেন। কিন্তু দু'আর পূর্বে 'আল ফাতিহা' বলে সকলকে জড়ো করা এবং এটাকে বিশেষ জরুরী হিসেবে অবশ্য পালনীয় মনে করা বিদআত। এর কোন ভিত্তি নেই। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি ও চাপাচাপি করা নিকৃষ্ট বিদআত।

মসজিদের ইমাম সাহেবকে এ জাতীয় কাজে বাধ্য করা মুতাওয়াল্লীদের জন্য কোনোভাবেই বৈধ নয়। এ নিয়ে চাপ প্রয়োগ করা একেবারেই শরীয়ত বিরোধী এবং বিদআতের প্রচার প্রসারে পৃষ্ঠ পোষকতার সামিল। এরা বিদআত আবিস্কারের গুনাহে অভিযুক্ত হয়ে শরঈ দৃষ্টিতে কঠিন গুনাহগার হবে।

মাসআলা : হাদীস শরীফে ঘুমানোর পূর্বে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশের সময়, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়, সহবাসের পূর্বে এবং পরে, বাথরুমে প্রবেশের সময় এবং বের হওয়ার সময় এ সকল ক্ষেত্রে দু'আ বর্ণিত আছে। কিন্তু সুন্নত ও নফলের পর সম্মিলিত দুআ পড়া বর্ণিত নেই কেন? এটা বাস্তবেই যদি প্রমাণিত থাকত, তাহলে অবশ্যই তা বর্ণিত থাকত। তাই বোঝা গেল যে, ইমাম ও মুক্তাদী মিলে সম্মিলিতভাবে সুন্নতের পর দু'আর প্রথাই প্রচলিত ছিলনা। সুতরাং এটি বিদআত হওয়ার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মূলত সেই আমলই গ্রহনযোগ্য যা, ইখলাসের সাথে হবে এবং সুন্নত পদ্ধতি অনুযায়ী হবে।

—ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৬/১৮৮, ১০/৪৪১, আগলাতুল আওয়াম : ৯৭

নামাযের পর উঁচু আওয়াজে কালেমা পড়া

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর নামাযী ও মাসবূকদের দিকে খেয়াল না করে জোরে জোরে কালেমা পাঠ করা মাকরূহ ও বিদআত। মসজিদের মাকরূহ বিষয়সমূহের আলোচনার অধ্যায়ে 'আদদুররুল মুখতার' গ্রন্থে এটাকেও উল্লেখ করা হয়েছে। জোর আওয়াজে যিকির জায়েয এবং মুস্ত াহাব; কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিশেষ পদ্ধতিতে যিকির করাকে জরুরী মনে করা আর এ কারণে যদি কোন নামাযীর নামাযে সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে তা বিদআত হয়ে যায়। —ফাতাওয়া দারুল উলুম : ৪/১৪

মাসআলা : অধিকাংশ সাধারণ জনগণের অভ্যাস হল দু'আ শেষে উভয় হাত মুখে মোছার সময় কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করে। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবা অনেক ফযীলতপূর্ণ এবং উঁচুমাপের শ্রেষ্ঠ যিকির। কিন্তু দু'আর সময় যেহেতু এটা পড়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাই এটা বর্জন করে দু'আ শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। —আগলাতুল আওয়াম : ৯৭

নামাযের পর মুসাফাহা করা

মাসআলা : প্রত্যেক নামাযের পর মুসাফাহাকে জরুরী মনে করা বিদআত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের পরবর্তী আইম্মায়ে দ্বীন ও আসলাফে উম্মত থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। —ইমদাদুল মুফতীন : ১/২২

মাসআলা : দুই ঈদের নামাযের পর মুসাফাহা করার প্রথাটি বিদআত। তবে অন্যান্য সময়ের ন্যায় নতুনভাবে সাক্ষাত হলে ঈদের নামাযের পরও মুসাফাহা করাতে কোন সমস্যা নেই। —ইমদাদুল আহকাম ১/১৮৮, নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১২৮

মাসআলা : লোকজন ফরয নামাযের পরও মুসাফাহা করে, এর কোন শরঈ ভিত্তি নেই। ফজর, জুমুআ এবং আসর নামায শেষে এমনকি পাঞ্জেগানা নামাযের পরও অনেকে গুরুত্ব সহকারে মুসাফাহা করে, এটি বিদআত। ইমাম সাহেবের উচিত মুসল্লীদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা এবং এ থেকে নিষেধ করা। শরীয়তে মুসাফাহার সময় হলো দু'জনের

সাক্ষাত লাভের সময়; নামায সমাপ্ত হওয়ার পর নয়। সুতরাং শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে মুসাফাহা করবে, এর বাইরে অন্য সময়ে মুসাফাহা করা থেকে বিরত থাকবে ও বারণ করবে। ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৩/৭২, বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'মাসায়েলে আদাব ওয়া মুলাকাত।'

মুসাফাহার ফযীলত বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا.

অর্থ : "দুই জন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাত লাভের পর যখন মুসাফাহা করে তারা একে অন্যের হাত ছাড়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।" —তিরমীযি শরীফ : ২/৯৭

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সালামের পরই মুসাফাহার প্রকৃত সময় আর মুসাফাহা হচ্ছে সালাম এর পরিশিষ্ট, তাই তা সালামের পরেই হওয়া চাই।

'মাজালিসুল আবরার' গ্রন্থে এসেছে,

واما المصافحة فسنة عند التلاق

মুসাফাহা সাক্ষাতের সময় করাই সুন্নত।

হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "দুই জন মুসলমান সাক্ষাতের পর যখন মুসাফাহা করে, পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়"। —তিরমীযি ও ইবনে মাজাহ

সাক্ষাতের সময় ব্যতীত ফজর, আসর, জুমুআ এবং ঈদের নামাযের পর সুন্নত মনে করে মুসাফাহার যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে তা ভুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনসহ কারো থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

—ফাতাওয়া রহীমিয়া : ১০/৪৪৫

মৃত ব্যক্তির ঘরে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সমবেত হওয়া

মাসআলা : নির্দিষ্ট দিন ও তারিখে মৃত ব্যক্তির ঘরে কুরআন পড়া এবং এ উপলক্ষে হাফেযদেরকে সমবেত করা, খতম শেষে মিষ্টি, শিরনী ইত্যাদি বণ্টন করা এবং খতমের বিনিময় হিসেবে নগদ টাকা দেয়ার প্রচলিত পদ্ধতি ও প্রথাটি নিষিদ্ধ ও মাকরূহ।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৩/১৯৫, শামী : ১/৮৪২

মাসআলা : কারো মৃত্যুর তিন দিনের মাথায়, দশম তারিখ এবং চল্লিশতম দিবসকে ঈসালে সওয়াবের জন্য নির্ধারণ করা বিদআত ও গোমরাহী। এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ঈসালে সওয়াব একটি পূণ্যের কাজ যা দিনক্ষণ বা কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই করতে হবে।

–ফাতাওয়া রশীদিয়া : ১৫৪,
ফাতাওয়া মাহমূদিয়া : ১/২২৮

জানাযার সাথে উচ্চ আওয়াজে কালেমা পাঠ করা

মাসআলা : জানাযা এর সাথে চলার সময় নিচু আওয়াজে যিকির এর অনুমতি আছে, উঁচু আওয়াজে যিকিরের অনুমতি নেই; বরং তা মাকরূহ। অতএব জানাযার সামনে সম্মিলিতভাবে উঁচু আওয়াজে সূর মিলিয়ে কালেমা পাঠ করার প্রচলিত পদ্ধতি সুন্নাত বিরোধী এবং মাকরূহে তাহরীমী।

মাসআলা : জানাযা নামাযই হচ্ছে অনেক বড় মাপের দু'আ। জানাযা নামাযের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করা প্রমণিত নয়। জানাযার সাথে চলার পথে মনে মনে ক্ষীণ আওয়াজে দু'আ করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে জানাযা আটকিয়ে রেখে সম্মিলিতভাবে দু'আ করার প্রথাটি সুন্নতবিরোধী ও মাকরূহ।

মাসআলা : দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর কয়েক কদম হেটে দু'আ করা এবং মৃত ব্যক্তির ঘরে গিয়ে একত্রিত হওয়ার প্রথাও শরীয়ত বিরোধী।

–ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৬/১৯৪, শামী : ১/৮৩৮,
আলবাহরুর রায়েক : ৫/৭৬

বিদআতীদের জানাযা নামায পড়া

মাসআলা : তাযিয়াভক্ত, মৃতদের জন্য শোক গাঁথা ইত্যাদি পাঠ কারী এবং বে-নামাযীদের জানাযা নামায পড়া জায়েয। কেননা এসকল লোক ফাসেক। আর ফাসেকের জানাযা পড়া ওয়াজিব। অতএব এদের জানাযা অবশ্যই পড়তে হবে। —ফাতাওয়া রশীদিয়া : ২৭০

মাসআলা : বিদআতীর সাথে এমন কোনো আচরণ করা নাজায়েয যা তাকে বিদআতী হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং বিদআতের প্রতি শক্তি সঞ্চার করে। —নেযামুল ফাতাওয়া : ১/১২৩

اللهم اجعله خالصاً لوجهك الكريم وتقبل منى انك انت السميع العليم رب اجعلنى مقيم الصلوة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء .ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

কবীরা গুনাহসমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

'তোমরা যদি বড় বড় গোনাহ্গুলো হতে বিরত থাক, তবে তোমাদের ছোট ছোট গোনাহ্গুলো আমি সরিয়ে দেব, মাফ করে দেব।'

এ আয়াত দৃষ্টে এখানে বেশ কিছু কবীরা গোনাহ্ তথা বড় বড় গোনাহ্ সমূহের একটা সূচী দেওয়া হচ্ছে। যাতে সব সময় এ সূচীটি সামনে রেখে গোনাহ্ হতে বিশেষত বড় বড় গোনাহ্গুলো হতে আমরা বিরত থাকতে পারি।

(১) যিনা অর্থাৎ নারীর সতীত্ব বিনষ্ট করা।

(২) লাওয়াতাত অর্থাৎ ছেলেদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়া।

(৩) মদ পান করা যদিও তা এক ফোঁটাই হোক না কেন। এমনিভাবে তাড়ী, গাঁজা প্রভৃতি নিশা জাতীয় জিনিস পান করাও কবীরা গুনাহ।

(৪) চুরি করা।

(৫) সত্বী সাধ্বী নারীর উপর যিনার অপবাদ দেওয়া।

(৬) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

(৭) সাক্ষ্যগোপন করা-যখন তাকে ছাড়া অন্য কোন সাক্ষ্যদাতা না থাকে।

(৮) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

(৯) মিথ্যা কসম খাওয়া।

(১০) কারও ধন-সম্পদ লুট করা।

(১১) জিহাদের ময়দান হতে (মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও) পলায়ন করা।

(১২) সুদ খাওয়া।

(১৩) অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল খাওয়া।

(১৪) ঘুষ লওয়া।

(১৫) পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া।

(১৬) আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (নিকটাত্নীয়দের হক আদায় না করা)

(১৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্বেচ্ছায় কোন মিথ্যারোপ করা।

(১৮) কোন ওযর-অসুবিধা ছাড়াই রমজানের রোযা ভঙ্গ করা।

(১৯) ওযনে কম দেওয়া।

(২০) কোন ফরয নামাযকে তার নির্ধারিত ওয়াক্তের আগে বা পরে আদায় করা।

(২১) যাকাত কিংবা রোযাকে নির্ধারিত সময়ে আদায় না করা। (ওযর থাকলে তা ভিন্ন কথা)

(২২) ফরয হজ্জ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করা। (যদি মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করে যায় এবং হজ্জ আদায়ের খরচাদিসহ যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে যায় তাহলে গুনাহ্ থেকে মুক্তি পাবে।)

(২৩) অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করা।

(২৪) কোন সাহাবীকে মন্দ বলা।

(২৫) উলামায়ে কিরাম ও হাফেজগণকে মন্দ বলা এবং তাদের বদনাম করার পেছনে লাগা।

(২৬) যালিমের কাছে কারও চুগলখোরী (কুটনামী) করা।

(২৭) আপন স্ত্রী, কন্যা, বোন ও অধিনস্থ মেয়েদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম কাজে লিপ্ত করা অথবা তাতে রাজী থাকা।

(২৮) কোনো বেগানা মহিলাকে হারাম কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং এর জন্য দালালী করা।

(২৯) ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ পরিত্যাগ করা।

(৩০) যাদু নিজে শিখা, অপরকে শিখানো বা এর উপর আমল করা।

(৩১) কুরআন শরীফ মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া। (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় অলসতা ও অবহেলার দরুণ ভুলে যাওয়া) অবশ্য অসুস্থতা বা দুর্বলতার কারণে ভুলে গেলে গোনাহ হবে না) কোন কোন আলেম বলেছেন, ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো, দেখেও পড়তে না পারা।

(৩২) কোন জীবন্ত প্রাণীকে আগুনে পুড়ানো। (অবশ্য সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদির অনিষ্টতা ও উৎপাত হতে বাঁচার জন্য পোড়ানো ব্যতিত অন্য কোন উপায় না থাকলে পোড়াতে কোন দোষ নেই।

(৩৩) কোন স্ত্রী লোককে তার স্বামীর নিকট যেতে এবং স্বামীর হক আদায় করতে বাঁধা দেওয়া।

(৩৪) আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া।

(৩৫) আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে নির্ভয় হওয়া অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে ভয় না করা।

(৩৬) মৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া। (অবশ্য নিরুপায় হয়ে খাওয়াতে কোন দোষ নেই)।

(৩৭) শূকরের গোশত খাওয়া (নিরুপায় হয়ে খেলে কোন গুনাহ্ হবে না)।

(৩৮) চোগলখুরী (কুটনামী) করা।

(৩৯) গীবত করা অর্থাৎ কোন মুসলমান বা অমুসলমানের অগোচরে তাদের দোষ বর্ণনা করা।

(৪০) জুয়া খেলা ।

(৪১) সম্পদের অপচয় অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা।

(৪২) সমাজে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা।

(৪৩) শাসক বা বিচারক হয়ে ন্যায়ভাবে বিচার না করা।

(৪৪) স্ত্রীকে মা বা মেয়ের মত বলা। আরবীতে একে 'যিহার' বলে।

(৪৫) ডাকাতি করা।

(৪৬) কোন সগীরা গুনাহ বারবার করা।

(৪৭) অপরকে গোনাহের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা বা গোনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

(৪৮) গান শোনা বা শোনানো।

(৪৯) মানুষের সামনে সতর খোলা।

(৫০) হযরত আলী রাযি.-কে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. ও উমর ফারুক রাযি. অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা।

(৫১) কোন ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়) হক আদায় করতে কৃপণতা করা।

(৫২) আত্নহত্যা করা বা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজ দেহের কোন অঙ্গ নষ্ট বা অকেজো করে ফেলা। ইহা অপরকে হত্যা করার চাইতেও মারত্নক ও অধিক গোনাহ।

(৫৩) প্রস্রাবের ফোঁটা-ছিটা হতে না বাঁচা।

(৫৪) সদকা বা হাদিয়া দিয়ে খুটা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়া।

(৫৫) তাকদীরকে অস্বীকার করা।

(৫৬) নিজ আমীরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

(৫৭) গণক বা জ্যোতিষির কথা বিশ্বাস করা।

(৫৮) অন্যের বংশকে খারাপ বলা বা দোষারোপ করা।

(৫৯) নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাখলুক (যেমন, পীর, ফকীর, গাউস কুতুব) ইত্যাদির নামে মান্নত ও জানোয়ার কুরবানী করা।

(৬০) লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি স্বেচ্ছায় ও অহংকার বশতঃ টাখনুর নিচে পরিধান করা।

(৬১) কোন ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করা বা কোন কুপ্রথা চালু করা।

(৬২) মুসলমান ভাইকে তলোয়ার, চাকু, বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি দেখিয়ে মেরে ফেলার ইশারা করা।

(৬৩) ঝগড়া-ফাসাদ বা মারপিটের অভ্যাস থাকা।

(৬৪) আপন গোলামকে খাসী বানানো অথবা তার কোন, অঙ্গ কেটে ফেলা অথবা তাকে অযথা কষ্ট দেওয়া।

(৬৫) অনুগ্রহ বা উপকারকারীর প্রতি না শোকরী বা অকৃতজ্ঞ হওয়া।

(৬৬) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে দিতে কৃপণতা করা।

(৬৭) হেরেম শরীফে ধর্মদ্রোহীতা বা কোন গুমরাহীর কাজ করা।

(৬৮) মানুষের গোপন দোষ তালাশ করা এবং উহার পেছনে লাগা।

(৬৯) গুটি দ্বারা জুয়া খেলা। তবলা, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাজানো (যে সকল খেলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত, সেগুলোতে লিপ্ত হওয়াও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত)।

(৭০) ভাং খাওয়া বা পান করা।

(৭১) এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফির বলা।

(৭২) একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের অধিকার আদায়ে সমতা রক্ষা না করা।

(৭৩) হস্তমৈথুন করা (অর্থাৎ স্বীয় হাত ইত্যাদি দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে বীর্যপাত ঘটানো)

(৭৪) হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া।

(৭৫) মুসলমানদের দুরবস্থা ও অভাব অনটনে আনন্দ বোধ করা।

(৭৬) কোন জানোয়ার যেমন, গাভী, বকরী, ভেড়া ইত্যাদির সাথে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া। (নাউযুবিল্লাহ)

(৭৭) আলেম তাঁর ইলেম অনুযায়ী আমল না করা।

(৭৮) কোন খাদ্যদ্রব্যকে মন্দ বলা (বানানো বা পাকানোর খারাবী বর্ণনা করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়)

(৭৯) গান-বাজনাসহ নাচা।

(৮০) দুনিয়াকে মহব্বত করা অর্থাৎ দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া।

(৮১) দাঁড়িবিহীন ছেলেদের প্রতি কামভাবসহ দৃষ্টিপাত করা।

(৮২) অপরের ঘরে উঁকি মারা।

(৮৩) বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা।

(এ ব্যাপারে মুসলমানগণ চরম উদাসীন–অনেকেই অজ্ঞতাবশতঃ বা জেনে এই মহাপাপে লিপ্ত তাদের থেকে আল্লাহ্ আমাদের হিফাযত করুন–)

৪০ টি সগীরাহ গুনাহ সমূহ

(১) গাইরে মাহরাম অর্থাৎ যে সকল মহিলাদের সাথে বিবাহ জায়েয, স্বেচ্ছায় তাদের দিকে তাকানো অথবা স্পর্শ করা অথবা এরূপ মহিলার সাথে নির্জন ঘরে বসা। (২) কোন মানুষ বা পশুকে অভিশাপ দেওয়া। (৩) এরূপ মিথ্যা বলা-যদ্দারা অপরের ক্ষতি না হয়। (৪) কোন মুসলমানের দুর্নাম রটানো– যদিও তা সত্য হয় এবং ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে করা হয়। (৫) বিনা প্রয়োজনে এমন বিল্ডিং বা উচুঁ স্থানে আরোহণ করা যেখান থেকে অন্য লোকদের ঘর-বাড়ী দেখা যায়। (৬) বিনা ওযরে অর্থাৎ উপযুক্ত কারণ ব্যতিত কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা। (৭) না জেনে-শুনে ও যাচাই বাছাই না করেই কারও পক্ষ অবলম্বন করা অথবা জেনে শুনে সত্যের বিপরীতে ঝগড়া করা। (৮) নামাযে ইচ্ছাকৃত ভাবে হাসা বা কোন মুসীবতের কারণে ক্রন্দন করা। (৯) পুরুষদের রেশমী কাপড় ব্যবহার করা। (১০) কথাবার্তা ও চাল-চলনে অহংকার ও উদ্ধত ভাব প্রকাশ করা। (১১) কোন ফাসিক–পাপাচারীর নিকট বসা। (১২) মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে ও অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বি-প্রহরের সময় নামায পড়া। (১৩) নিষিদ্ধ দিনগুলিতে (দুই ঈদ ও তাশরীকের দিনগুলিতে) রোযা রাখা। (১৪) মসজিদে নাপাক বা অপবিত্র জিনিস প্রবেশ করানো। (১৫) মসজিদে কোন

পাগল বা এমন ছোট শিশু নিয়ে যাওয়া যাদের দ্বারা মসজিদ নাপাক হওয়ার আশংকা থাকা। (১৬) প্রস্রাব পায়খানার সময় কেবলামুখী হয়ে অথবা কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসা। (১৭) গোসল খানায় কাপড়-চোপড় খুলে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া– যদিও সেখানে কোনো লোক না থাকে। (১৮)'সওমে ভেসাল' অর্থাৎ মাঝখানে একদিনও বাদ না দিয়ে একাধারে রোযা রাখা। (১৯) যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে যিহারের কাফফারা আদায়ের পূর্বে সহবাসে লিপ্ত হওয়া।

(২০) মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের সফর করা। (অবশ্য নিরুপায় হয়ে তাদের একাকী বা গাইরে মাহরামের সাথে সফর করাতে কোন অসুবিধা নেই) (২১) কোন বস্তু নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে দাম-দর চলছে, অথবা কোন মহিলার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুই পক্ষ আলাপ-আলোচনা করছে, এমতাবস্থায় তাদের চূড়ান্ত যবাবের পূর্বে তাদের বেচা কেনা বা বিবাহের পয়গামে কোনরূপ বাঁধার সৃষ্টি করা। (২৩) গ্রামবাসীরা যে সকল মালা-মাল শহরে নিয়ে আসে সেগুলোকে দালালী করে ক্রয় করা। (২৪) শহরের উদ্দেশ্যে আগত মালামাল শহরে পৌছার পূর্বেই শহরের বাইরে গিয়ে খরিদ করে ফেলা। (২৫) জুম'আর আযানের পর বেচাকেনা করা। (২৬) বিক্রয়ের সময় মালের দোষ ত্রুটি গোপন করা। (২৭) সখ করে কুকুর পালা। (শিকার বা ফসলের হিফাযতের উদ্দেশ্যে পাললে তা জায়েয আছে) (২৮) মদ ঘরে রাখা। (২৯) দাবা খেলা। (৩০) মদ বেচা-কেনা করা (৩১) মামুলী বা সাধারণ জিনিস এক দুই মুষ্ঠি চুরি করা। (৩২) হাদীস শোনানো বা বলে দেওয়ার বিনিময়ে চুক্তি করে পারিশ্রমিক লওয়া। (৩৩) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা। (৩৪) পানির ঘাট বা গোসল খানায় প্রস্রাব করা। (৩৫) নামাযে নিয়মের বিপরীত কাপড় পরিধান করা। (৩৬) জানাবাত অর্থাৎ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় আযান দেওয়া। (৩৭) জানাবাতের অবস্থায় বিনা ওযরে মসজিদে প্রবেশ করা। (৩৮) নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো। (৩৯) নামাযে লম্বা চাদর এভাবে পরিধান করা যে, এর ভেতর থেকে হাত বের করা মুশকিল হয়ে পড়ে। (৪০) নামাযে কাপড় অথবা শরীর নিয়ে খেলা করা অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কোন অঙ্গ নাড়াচাড়া করা অথবা কাপড় উলট-পালট করা।

দারুল উলূম দেওবন্দ-এর মুফতী সাহেবদের সত্যায়িত

সর্বস্তরের উলামা-মাশায়েখ সমর্থিত

দলিল প্রমাণসহ মাসায়েলে শিরক ও বিদআত সম্পর্কিত

১২০০-এর অধিক মাসলা-মাসায়েল

মুকাম্মাল মুদাল্লাল

মাসায়েলে শির্‌ক ও বিদ্‌আত

মাওলানা রাফ্‌আত কাসেমী

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০